অগ্নিমানুষ

সুমন্ত আসলাম

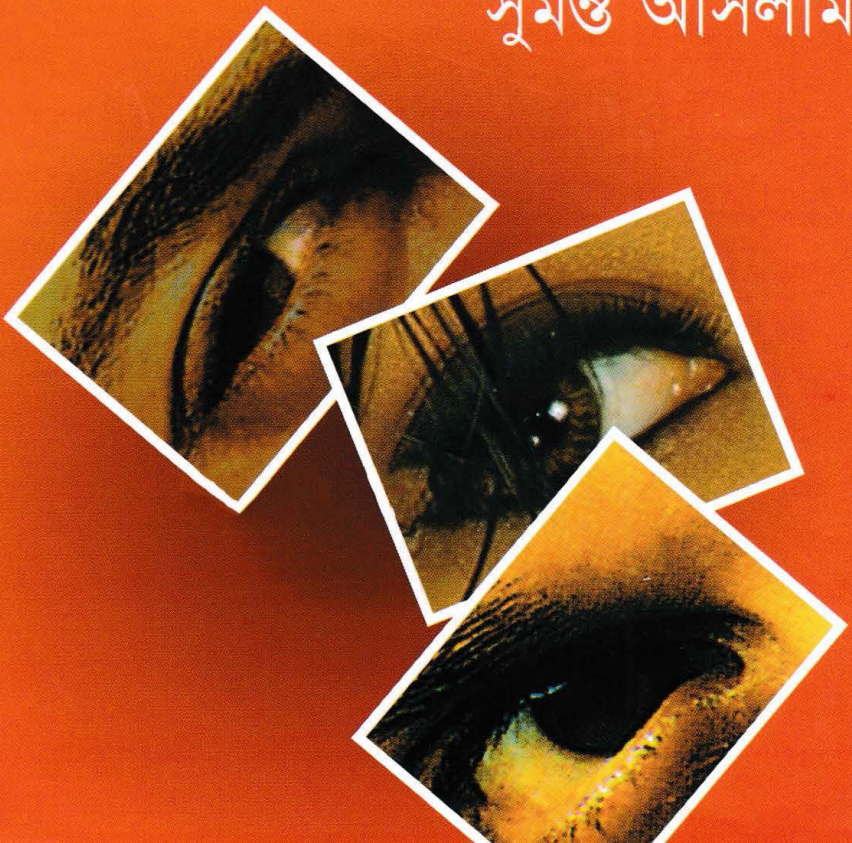

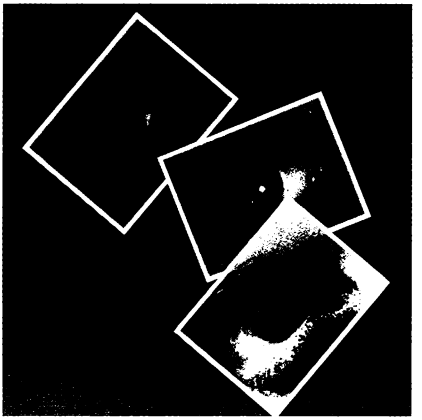

রাশীকের কথাটা শোনার পরপরই মিমি বলে, 'আমরা পারব তো রাশীক?'

রাশীক বলে, 'পারতে তো আমাদেরই হবেই। তার আগে কয়েকজন মানুষ দরকার আমাদের।'

'মানুষ!' কিছুটা চমকে ওঠে মিমি।

'হ্যাঁ মানুষ, সাহসী মানুষ।'

চুপচাপ বসে এতক্ষণ মুগ্ধ হয়ে কথাগুলো শুনছিল ত্রিদিব। আধা ঘন্টা ধরে যে পরিকল্পনার কথা বলল রাশীক, তাতে সে একটু আপত্তি করল। কিছুটা উত্তেজিত হয়ে সে বলল, 'অসৎ মানুষদের শাস্তি এত সহজে, এত অল্প হলে হয় না রাশীক। তার শাস্তি হওয়া উচিত একটু সময় নিয়ে, একটু কঠিন উপায়ে।'

অবশেষে রাশীক, মিমি, ত্রিদিব আর মিতু বেরিয়ে পড়ে মানুষ খুঁজতে, সাহসী মানুষ। দেশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত তারা ঘুরে বেড়ায়। পেয়ে যায় বিচিত্র সব মানুষ, বিচিত্র তাদের জীবন, বিচিত্র তাদের কাহিনী। কখনো সেগুলো হৃদয় বিদীর্ণ করা, কখনো সেগুলো অবিশ্বাস্য, কখনো সেগুলো শিহরিত করা ঘটনা। তারপর?

তারপর তারা বাস্তবায়ন করতে চায় তাদের সে পরিকল্পনা—ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা!

প্রিয় পাঠক, যদি আপনি নিজেকে সাহসী মনে করেন, তাহলে প্লিজ রাশীকদের সঙ্গে চলুন, না হলে...।

কারণ এ সময়ে কিছু সাহসী মানুষ দরকার!

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

অগ্নিমানুষ

সুমন্ত আসলাম

৭৮০৪২

সময়

অগ্নিমানুষ

সুমন্ত আসলাম

© লেখক

দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০০৬

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০০৬

সময়

সময় ৫৩৮

প্রকাশক

ফরিদ আহমেদ

সময় প্রকাশন

৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ

ধ্রুব এষ

কম্পোজ

সময় কম্পিউটার্স

৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা

মুদ্রণ

সালমানী প্রিন্টার্স, নয়াবাজার, ঢাকা

মূল্য : ১০০.০০ টাকা মাত্র

AGNIMANUSH (Man of Fire) a novel by Sumanto Aslam. First Published : Book Fair 2006 by Farid Ahmed. Somoy Prakashan. 38/2ka Banglabazar, Dhaka.

Web : www.somoy.com E-mail : f.ahmed@somoy.com

Price : Tk. 100.00 Only

ISBN 984-458-538-4 Code : 538

দিনটা রোববার ছিল, ২০০৪ সালের ৫ সেপ্টেম্বর। সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথম আলো পড়তে পড়তে চোখটা থমকে যায় হঠাৎ— বাংলাদেশে এখন সুযোগ্য নেতৃত্ব দরকার। ধ্রুব সত্য এ কথাটা যিনি বলেছেন, তাকে চিনি, কিন্তু দেখিনি কখনো। সাহাসী কথাটা পড়ার পর তার সাক্ষাৎকারটা পড়তে থাকি আমি। সাক্ষাৎকারটা পড়ছি, আর একটু একটু করে ঘামছি। বুকের ভেতরের সমস্ত ক্ষোভ একসময় উথলে ওঠে— হ্যাঁ, এ দেশে এখন একজন সৎ মানুষের নেতৃত্ব দরকার, একজন দেশপ্রেমিক মানুষের ভালোবাসা দরকার, এ মুহূর্তে সাহসী একটা পদক্ষেপ দরকার।

প্রিয় ফজলে হাসান আবেদ

ব্র্যাকের মাধ্যমে সমাজকল্যাণমূলক কাজ করে আপনি সমাজের অনেক কিছুই বদলে দিয়েছেন। আপনাকে অভিনন্দন। জীবনে আমি অনেক সাক্ষাৎকার পড়েছি, কিন্তু আপনার মতো এমন সাহসী কথা খুব কম মানুষই বলেছেন। সত্যি এখন একটা সযোগ্য নেতৃত্ব দরকার।

আমি তো বলব সরকার সব জায়গায় ব্যর্থ হয়েছে। অদক্ষতা তো আছেই, কিন্তু দক্ষতা বাড়ানোর কোনো চেষ্টাও নেই। কোনো কিছুর মধ্যেই তো আমি সরকারের কোনো দক্ষতা দেখি না। আমি সব সরকারের কথাই বলছি। সচিবালয়ে গেলে, লোকজনের চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, এরা কাজ করে না, ঢাকা-পয়সা না দিলে ফাইল নড়ে না। আজকাল মন্ত্রণালয়েরও দুর্নীতি ঢুকেছে, ঘুষ না দিলে কাজ হয় না।

কিন্তু আশার দিক হচ্ছে আমাদের জনগণ। সরকার যা-করুক না-করুক, আমাদের জনগণ অতিশয় কর্মঠ। তারা তাদের পরিবার, তাদের সমাজের জন্য যথাসাধ্য কাজ করে। আমাদের কৃষক, তিনি সার পান আর না পান, বীজ তার নষ্ট হোক বা বন্যায় তলিয়ে যাক, তিনি আবার চারা রোপণ করবেন, ফসল ফলাবেন। দেশের জন্য না হলেও নিজের জন্য কাজ করবেন।

সরকারের দিকে তাকিয়ে না থেকে নিজ সন্তানকে লেখা-পড়া শেখানোর চেষ্টা করছে মানুষ। স্কুলে পড়াশোনা না হলে নিজ বাড়িতে মাস্টার রেখে চেষ্টা করছে। বেঁচে থাকার জন্য তারা যা যা দরকার সাধ্যমতো করছে।

—ফজলে হাসান আবেদ

রাশীকের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগল মিমি। তারপর ছোট্ট করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে কপালে নেমে আসা চুলগুলো পেছনে ঠেলে দিয়ে বলল, 'পারব তো আমরা?'

মিমির চোখের দিকে তাকাল রাশীক। বেশ কিছুক্ষণ সেভাবে তাকিয়ে থেকে আলতো করে হাত রাখল ওর কাঁধে। একদম নিশ্চুপ এ মুহূর্তটা। ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ছেড়ে সোজা হয়ে বসল রাশীকও। তারপর খুব আগ্রহের ভঙ্গি নিয়ে বলল, 'তোর কী মনে হয়?'

'সবকিছু স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে।'

'এটা তো স্বপ্নই, কেবল তার বাস্তবায়ন চাচ্ছি আমরা।'

'যদি ব্যর্থ হই?' নিজের কাঁধে রাখা রাশীকের হাতের ওপর হাত রাখল মিমি।

'আমরা আবার শুরু করব।'

'তার পরও যদি ব্যর্থ হই।'

'তার পরও শুরু করব। সেটা আর তখন স্বপ্ন থাকবে না, দায়িত্ব হয়ে যাবে।' সামনে বসে থাকা মিতু, ত্রিদিব ও মিমির দিকে একবার করে তাকিয়ে ও আবার বলল, 'যদিও এখনো এটা দায়িত্বই।'

আধঘণ্টা ধরে যে পরিকল্পনার কথা বলল রাশীক, মুগ্ধ হয়ে তা শুনছিল ত্রিদিব। কিন্তু রাশীক কথা শেষ করতেই কিছুটা আপত্তি করল সে, 'অসৎ একজন মানুষের শাস্তি এত সহজে, এত অল্প হলে হয় না রাশীক। তার শাস্তি হওয়া উচিত সময় নিয়ে, একটু কঠিন উপায়ে।'

'আমাদের তো এত সময় নেই ত্রিদিব।'

'সত্যি নেই?'

'না।'

'আমারও তা-ই মনে হয়।' মিতু ত্রিদিবের দিকে তাকাল। কিন্তু ত্রিদিব

তাকিয়ে আছে অন্যদিকে। দুটো চড়ুইপাখি বসে আছে জানালার গ্রিলে। একটার মুখে ছোট্ট একটা কুটো, বিল্ডিংয়ের কার্নিশে বাসা বানানোর আয়োজনে ব্যস্ত। তার সঙ্গে থেকে উৎসাহ দিচ্ছে অন্য চড়ুইটা।

রাশীক খুব নরম স্বরে ডাক দিল, 'ত্রিদিব।'

চড়ুই থেকে চোখ সরিয়ে আস্তে আস্তে রাশীকের দিকে তাকাল ত্রিদিব। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল রাশীক। চোখ দুটো লাল হয়ে গেছে ওর—একটু পর থু করে একটা শব্দ করল, যেন কাউকে থুথু ছিটাল ও। ঠিক সেদিনের মতো।

নিজস্ব একটা কাজে দূরসম্পর্কের এক দাদা ইমরুল চৌধুরীর বাসায় গিয়েছিল একবার রাশীক। দু-তিন বছর আগের কথা। বাসায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে দাদী বললেন, 'ভীষণ ভয়ে আছি রে রাশীক।'

রাশীক কিছুটা অবাক হয়ে বলল, 'কেন?'

'বাসায় ঢোকার সময় ড্রইংরুমে একটা ছেলেকে দেখিসনি?'

'দেখেছি।'

'ছেলেটা তোর দাদার সঙ্গে দেখা করতে চায়, সেই সকাল থেকে বসে আছে তোর দাদার সঙ্গে দেখা করার জন্য।'

'দাদা দেখা করেননি?'

'না।'

'কেন?' কপাল কুঁচকে দাদীর দিকে তাকাল রাশীক। তারপর বলল, 'ছেলেটা দাদার সঙ্গে দেখা করতে চায়, এতে অসুবিধা কোথায়?'

'তোর দাদা দেখা করবে না।'

'কেন?'

'তা জানি না।'

কিছুক্ষণ ভেবে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল রাশীক। তারপর খুব আস্তে আস্তে বলল, 'ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি ছেলেটার কাছে।'

দোতলা থেকে নেমে একতলায় ড্রইংরুমে এলো রাশীক। মাথা নিচু করে বসে আছে ছেলেটা। খুব নিঃশব্দে ছেলেটার একেবারে কাছাকাছি গিয়ে সে বলল, 'আপনি কি ইমরুল চৌধুরীর কাছে এসেছেন?'

কোনো জবাব দিল না ছেলেটা।

'আপনি কি ইমরুল চৌধুরীর কাছে এসেছেন?'

এবারও কোনো জবাব দিল না ছেলেটা। এমনকি রাশীকের দিকে ফিরেও তাকাল না। শুধু জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল সে। রাশীক আবার প্রশ্ন করল, এবারও উত্তর দিল না ছেলেটা।

রাশীক মুখটা হাসি হাসি করে বলল, 'আপনি যদি আমার প্রশ্নের উত্তর না দেন, তাহলে বুঝব কী করে আমি?'

আলতো করে ঘুরে বসল ছেলেটা। তারপর রাশীকের দিকে তাকিয়ে খুব আস্তে করে বলল, 'একটু বসবেন?'

পাশের একটা চেয়ারে বসল রাশীক। মাথা আবার নিচু করে ফেলেছে ছেলেটা। বেশ কিছুক্ষণ সেভাবে থেকে হঠাৎ রাশীকের একেবারে চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মেঝের ওপর একটা তেলাপোকা পড়ে আছে, দেখেছেন?'

কিছুটা অবাক হয়ে রাশীক বলল, 'কই?'

'ওই যে।' হাত দিয়ে ইশারা করে ছেলেটা মেঝের বাঁ কোনাটা দেখাল। রাশীক সেদিকে তাকাতেই ছেলেটা আবার বলল, 'ইমরুল সাহেবের সঙ্গে আসলে আমি আর এখন তেমন কোনো কথা বলতে চাই না, আমি শুধু তাকে এ তেলাপোকাটা দেখাতে চাই। আপনি দয়া করে শুধু কয়েক মিনিটের জন্য এখানে একটু ডেকে আনবেন তাকে। প্রমিজ, আমি শুধু তাকে তেলাপোকাটা দেখাব আর মাত্র দুটো প্রশ্ন করব। তারপর চলে যাব। সেই সকালবেলা এসেছি এই বাসায়, ওনারা তো অস্বস্তি বোধ করছেন, বিরক্ত হচ্ছেন, আমারও ভীষণ লজ্জা লাগছে।'

রাশীক ছেলেটার চোখের দিকে গভীরভাবে তাকাল, ভেজা ভেজা চোখ ছেলেটার। মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ কান্না আটকে রেখেছে। সম্পূর্ণ চেহারাটায় এক ধরনের কাঠিন্য থাকলেও কোথায় যেন একটু মায়া লুকিয়ে আছে। রাশীক খুক্ করে একটু কেশে বলল, 'আপনার নামটা জানতে পারি?'

'ত্রিদিব।' ছেলেটা মুখটা একটু উজ্জ্বল করে বলল, 'আপনার নাম তো রাশীক।'

'আপনি জানলেন কী করে!' কপালটা একটু কুঁচকে ফেলে রাশীক।

'বিখ্যাত রাজনীতিবিদদের ছেলেমেয়েকে অনেকেই চেনে।'

ছেলেটার কথা শুনে রাশীক বেশ মুগ্ধ হলো। গলাটা গম্ভীর, উচ্চারণও স্পষ্ট।

'ত্রিদিব...।' রাশীক কথাটা শেষ করতে পারল না, তার আগেই ত্রিদিব আবার বলল, 'প্লিজ 'না' করবেন না, শুধু একবার ইমরুল সাহেবের সঙ্গে দেখা করব।' ব্যথিত মনে হলো ত্রিদিবের গলাটা। পরক্ষণেই কিছুটা উৎসাহী হয়ে তেলাপোকাটার দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, 'আপনি কি তেলাপোকাটা ভালো করে দেখেছেন?'

রাশীক তেলাপোকাটার দিকে তাকাল। চিৎ হয়ে পড়ে আছে সেটা মেঝের

ওপর। পাগুলো ব্যর্থভাবে নাড়াচাড়া করছে, নিষ্ফলভাবে দোলাচ্ছে মাথার শুঁড় দুটোও। ওঠার চেষ্টা করছে তেলাপোকাটা, কিন্তু পারছে না। কেমন যেন একটা অসহায় ভাব। বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেও যখন সফল হতে পারল না, ঠিক তখনই আশপাশ থেকে কয়েকটা পিঁপড়ে এসে তাকে কামড়ে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে বেশ জোরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে তেলাপোকাটা একটু সরে গেল। কিন্তু উঠতে পারল না, পড়ে রইল আগের মতোই। শুধু পিঁপড়ের সংখ্যা বাড়তে লাগল ক্রমাগত, সেই সঙ্গে বাড়তে লাগল তেলাপোকাটার ঝাঁকুনি, ব্যর্থ ঝাঁকুনি।

সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল রাশীক। ত্রিদিবের দিকে একবার তাকিয়ে ভেতরে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতে গিয়েই থেমে গেল। দাদী আর দাদা বিষণ্ন মুখে ড্রইংরুমে ঢুকছেন।

কিছুটা বড় বড় চোখে দাদী তাকিয়ে আছেন ত্রিদিবের দিকে, মাথাটা নিচু করে কী যেন দেখছেন দাদা মেঝের দিকে তাকিয়ে, আর একটু পরপর হাত দিয়ে মুখটা মুছে নিচ্ছেন। রাশীক খুব মনোযোগ দিয়ে দাদার দিকে তাকাল। দাদার মুখটা ঘেমেও যায়নি, কোনো ময়লাও লাগছে না একটু পরপর, কিন্তু হাত দিয়ে মুখ পরিষ্কার করার ভঙ্গিতে কখনো ডান হাত, কখনো বাঁ হাতটা নিয়ে যাচ্ছেন দাদা নিজের মুখের ওপর।

ত্রিদিব খুব দ্রুত দাদার কাছাকাছি গিয়ে বলল, 'বস্, কাজটা আপনি করতে পারলেন?'

মুখটা মোছার ভঙ্গিতে হাতটা মুখে নিয়ে দাদা বললেন, 'যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বোলো না।'

'কেবল আমরাই বুঝি না বস। আপনি আমাদের স্বপ্ন দেখালেন, নষ্ট রাজনীতির বাইরে নতুন একটা পথের কথা বললেন, আমাদের দিয়ে মিছিল-মিটিং করালেন, আপনার আদর্শ নিয়ে প্রচুর লেখালেখি করলেন বিভিন্ন পত্রিকায়। সেসবকে পায়ে দলে আপনি নতুন একটা রাজনৈতিক দলে যোগ দিলেন, যে দলের প্রধান দেশের সবচেয়ে বড় কালোবাজারি, ভূমিদখলকারী, ট্যাক্স ফাঁকিবাজ, মোট কথা দেশের একজন শত্রু!'

'এসব কথা তোমাকে কে বলল?' ধমকে ওঠেন দাদা। সঙ্গে সঙ্গে মুখটা মোছার ভঙ্গি করেন আবার।

'বস্, আপনার মনে আছে, এই লোকটার বিরুদ্ধেই আপনি অনেক দিন আগে একটা কলাম লিখেছিলেন?'

'পুরনো কথা টেনে আনছ কেন?'

'পুরনো ভুলে যাব আমরা? সম্ভব? ভুলে যাব আমরা আমাদের ঔদার্য,

ত্যাগ, নিঃস্বার্থতা? বস্...।' ত্রিদিব হঠাৎ থেমে গিয়ে মাথাটা নিচু করে ফেলে। একটু পর আবার তাকায় দাদার দিকে। ত্রিদিবের দু চোখ টলটল করছে পানিতে, 'জমি বিক্রি করা টাকা দিয়ে আমাদের এই ঢাকায় থাকা, লেখাপড়ার ভান করা। মূর্খ বাবা-মা প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত স্বপ্ন দেখে তাদের ছেলেমেয়ে একদিন সব দুঃখ দূর করে দেবে, সুখ-শান্তিতে ভরে যাবে তাদের সবকিছু। কিন্তু আমরা, কী করছি আমরা এখানে! কোথায় আমাদের ভবিষ্যৎ, কোথায় আমাদের স্থান?'

'এসব চিন্তা করতে কে বলেছে তোমাকে? তোমাদের তো আমি চিন্তা করতে বলিনি! তোমরা আমার সঙ্গে থাকবে।'

'কেন বস্, আপনার ভারসাম্য রক্ষা করতে, না শক্তি বৃদ্ধি করতে?'

'শোনো, বাস্তবতা শেখো।'

হো হো করে হেসে ওঠে ত্রিদিব। হাসতে হাসতে সে তাকিয়ে দেখে ইমরুল চৌধুরীর ছেলেমেয়ে দুটো বাসায় ঢুকছে। হাসির মাত্রাটা আরো একটু বাড়িয়ে দিয়ে ত্রিদিব বলে, 'নিজের ভবিষ্যৎ, ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ খুব ভালোভাবে গড়ে অন্যের ছেলেমেয়ের জীবন নিয়ে তামাশা করলেন সারা জীবন।'

লোপা আর জয় বাবা-মায়ের পাশে দাঁড়িয়েছে। ত্রিদিব খুব নির্ভারভাবে তাকাল ওদের দিকে। তারপর চোখ দুটো ফিরিয়ে আবার ইমরুল চৌধুরীর দিকে এনে বলল, 'আমাদের সনাতনী বাবা লেখাপড়া না শিখতে পারেন, কিন্তু বাবা স্বশিক্ষিত। অন্যকে কীভাবে মর্যাদা দিতে হয়, তা তারা আমাদের শিখিয়েছেন। গতকাল তর্ক করতে করতে আপনারই আদর্শে গড়ে ওঠা মিজান অনেক কষ্টে আপনার মুখে থুথু ছিটিয়ে দিয়েছিল, লজ্জায় আপনার মাথা নিচু হয়ে গিয়েছিল অতগুলো মানুষের সামনে। বস্, সে ইচ্ছেটা আমারও হয়েছে আজ। কিন্তু সন্তানদের সামনে একজন পিতাকে অপমান করতে আমার বিবেক কাঁপছে, সে পিতা যত অসৎই হোক, যত লোভীই হোক, হোক যত ধান্দাবাজ।' কথাটা শেষ করে সবার সামনেই একদলা থুথু ছিটিয়ে দিল ত্রিদিব মেঝের ওপর। সেদিকে তাকিয়েই ইমরুল চৌধুরী হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠেন, দু'হাত দিয়ে নিজের মুখটা খামচে খামচে কী যেন পরিষ্কার করার চেষ্টা করেন। যেন মোজাইকের ওপর থুথুটা পড়ে নেই, মেখে আছে তা দাদার মুখের ওপর।

ঘুরে দাঁড়াল ত্রিদিব। একটু এগিয়ে এসে রাশীকের সামনে এল, 'রাশীক, আমি আর আপনি প্রায় একই বয়সের। অথচ দেখুন, আমাদের ভাগ্যের বৈপরীত্য কত বিশাল। ওই যে তেলাপোকাটা আপনাকে দেখালাম, ওই তেলাপোকাটা হচ্ছি আমি, আমাদের মতো কোনো যুবক। আর ওই

পিঁপড়েগুলো হচ্ছে ইমরুল সাহেবদের মতো স্বার্থান্ধ মুখোশধারী।'

তেলাপোকাটার দিকে আবার তাকাল রাশীক।

আগের মতোই চিৎ হয়ে পড়ে আছে সেটা মেঝের ওপর। ব্যর্থ চেষ্টা করে চলছে নিজেকে রক্ষা করার।

ত্রিদিব রাশীকের হাতটা একটু ছুঁয়ে পা বাড়ায় বাইরের দিকে। কিছুদূর গিয়ে পেছন ফিরে তাকায় ইমরুল চৌধুরীর দিকে। মুখে আগের চেয়ে আরো ঘন ঘন হাত দিচ্ছেন তিনি। চেহারাটা করুণ করে আরো এক দলা থুথু ছিটিয়ে দিল ত্রিদিব মেঝের ওপর। কালো মোজাইকের ওপর সে ফেনা-তোলা থুথুটুকু কেমন যেন বিদ্রূপ করে উঠল, থুথুটা যেন হেসে উঠল ইমরুল চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে।

দু হাত চুলের ভেতর দিয়ে মাথাটা চেপে ধরে ত্রিদিব চলে যাচ্ছে। রাশীক একটু এগিয়ে গেল। তেলাপোকাটার সামনে গিয়ে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। ধুঁকে ধুঁকে মরার চেয়ে একেবারে মরাই ভালো—এটা ভেবে একটা পা চাপিয়ে দিল সেটার ওপর, মুহূর্তেই মেরে ফেলল সে মুমূর্ষু তেলাপোকাটাকে।

'রাশীক, কী ভাবছিস?'

কিছুটা চমকে উঠে রাশীক ত্রিদিবের দিকে তাকায়। তারপর হাসি হাসি মুখ করে বলে, 'কী ভাবছি? তোর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কথা।'

চোখ দুটো হঠাৎ ছলছল করে ওঠে ত্রিদিবের। আলতো করে রাশীকের একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে বলে, 'কষ্টমুখর পরিচয়।'

'তবুও পরিচয়।'

'আচ্ছা—।' রাশীকের হাত দুটো আরো চেপে ধরে ত্রিদিব বলে, 'আমরা প্রত্যেকেই কি একেকজন একেকটা তেলাপোকা নই?'

মিমি একটু ঝুঁকে এসে বলে, 'তেলাপোকা?'

'হ্যাঁ, তেলাপোকা। সারাক্ষণ নিজেকে লুকিয়ে রাখা, নিঃশব্দে বিচরণ করা।'

'আমরা কি সত্যি নিঃশব্দে বিচরণ করছি?'

'নয় তো কী?' রাশীক কেমন যেন বিদ্রূপ করে উঠল, 'চারপাশে আমাদের জীবনের এই যে এত সীমাহীন অপচয়, প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে। আমরা কি কিছু বলছি, আমরা কি নিঃশব্দে নিজেকে কেবল বাঁচিয়ে রাখছি না? প্রতিদিন আমাদের মূল্যবোধ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, মনুষ্যত্ব হারিয়ে যাচ্ছে, মানবতা ক্ষয়ে যাচ্ছে, আমরা কী করছি? অন্যায়ের ভারে নুয়ে যেতে যেতে আমরা মাটির সঙ্গে মিশে যাই, তবু আমরা চুপচাপ, বিড়বিড় পায়ে তেলাপোকার মতো আমাদের পথ-চলা। আচ্ছা রাশীক—।' সারা মুখ লাল করে ত্রিদিব বলে, 'আমরা

এতক্ষণ যে পরিকল্পনা করলাম, তা করতে পারব তো?'

সোজা হয়ে বসল রাশীক। সমস্ত শরীরে দৃঢ়-প্রত্যয় নিয়ে খুব স্পষ্টভাবে সে বলল, 'পারতে আমাদের হবেই। তার আগে কয়েকটা মানুষ দরকার আমাদের।'

'মানুষ!' কিছুটা শব্দ করে বলল মিমি।

'হ্যাঁ, মানুষ।' রাশীক ওর ডান হাতটা মুষ্টিবদ্ধ করে বলল, 'সাহসী মানুষ!'

হাতড়ে হাতড়ে ঘরে ঢুকেই দাদু বললেন, 'রাশীক, তুই নাকি কদিনের জন্য কোথাও যাচ্ছিস?'

দাদুর একটা হাত ধরে বিছানায় বসিয়ে রাশীক বলল, 'হ্যাঁ।'

'কোথায় যাচ্ছিস?'

'মানুষ খুঁজতে।'

'দুনিয়াতে এত মানুষ থাকতে তুই মানুষ খুঁজতে যাচ্ছিস!' দাদু হাসতে থাকেন।

রাশীক দাদুর চোখের দিকে তাকায়। আলোহীন ওই চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শব্দ করে একট দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে সে। তারপর কাঁপা কাঁপা গলায় বলে, 'কাকে মানুষ বলে, তুমি জানো দাদু? আমার বড় বোন—প্রতিনিয়ত যার ওয়ান টাইম বলপেনের মতো বন্ধু বদল, সর্বদা যার সাজসজ্জায় রঙিন মুখোশ, বছরে দু-একবার অঘটন, ক্লিনিক থেকে মুক্তি পাওয়া নিষিদ্ধ মাতৃত্ব। কিংবা আমার বড় ভাই—প্রতিমুহূর্তে নেশা করতে করতে যে জীবন্ত ফসিলে পরিণত হয়েছে, আর আমার মা—সমাজসেবার নামে যে অনর্গল অভিনয় করে বেড়ায়, স্বামীকে সিঁড়ি খুঁজে দিতে নিজেকে বিকিয়ে দেয়। এদের তুমি মানুষ ভাবতে পার দাদু, কিন্তু আমার ভাবতে আপত্তি আছে। আর তুমি যদি বাবার কথা বলো—তাহলে মানুষের সংজ্ঞা আমি পাল্টে ফেলব। বর্ণচোরা, অন্ধকারের কাউকে যদি মানুষের তালিকায় ফেলতে চায় কেউ, তাহলে এর প্রতিবাদে আমার শরীরের সমস্ত রক্ত বের করে ফেলব আমি, নাহয় নিজের দু চোখ উপড়ে ফেলব। যদি এত কিছু না পারি, অন্তত তার মুখে একদলা থুথু ছিটিয়ে দেব।'

'মাঝে মাঝে তুই এত অস্বাভাবিক হয়ে যাস দাদু।'

'আমার জন্মটাই যে অস্বাভাবিকভাবে দাদু।' রাগী চেহারাটা হঠাৎ কেমন নরম হয়ে যায়। চোখ দুটোও কেমন ভেজা ভেজা হয়ে যায় রাশীকের, 'তুমি

যদি অন্ধ না হতে, তাহলে এই বুকটা চিড়ে দেখাতাম—দেখতে বুকের ভেতর সে কালচে রঙের আগুন, প্রতিদিন নিজেকে আস্তে আস্তে পুড়ে ফেলার আগুন।'

'একটু কাছে আয় তো।' দাদু সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে দেন।

রাশীক দাদুর কাছে গিয়ে বসে। দাদু সঙ্গে সঙ্গে মাথায় হাত বোলাতে থাকেন ওর। এতটুকু জীবনের এ মুহূর্তটাই রাশীকের সবচেয়ে স্বর্গীয় মনে হয়, মনে হয় এটুকুর জন্যই বেঁচে আছে সে। দাদু মাথায় হাত বোলাচ্ছেন আর কাঁদছেন। কাঁদছে রাশীকও।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর রাশীক বলে, 'তোমার নাকি এক ভাই এসেছে দাদু?'

'হ্যাঁ, আমাদের গ্রামের এক ভাই এসেছেন।'

'কেন?'

'পেনশনের টাকা তুলতে।' দাদু একটু চুপ থেকে বলেন, 'আচ্ছা, তুই আসবি কবে?'

'তা তো জানি না।'

'জানিস না মানে?'

'জানি না দাদু।' রাশীক দাদুর একটা হাত চেপে ধরে শব্দ করে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, 'যদি আর কখনো ফিরে আসতে না হতো, এখানে, এ বাসায়!'

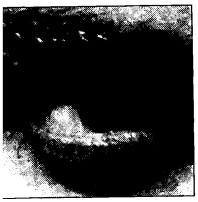

দুটো ঘটনা দু রকমের।

লুৎফুন নাহার মণি প্রচণ্ড আপত্তি করল—না, এখন সে বিয়ে করবে না। মাত্র চৌদ্দ বছর তার, কেবল অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে সে। আর মাত্র দু'বছর পর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে কলেজে উঠবে, কলেজ পাস করবে, তারপর আরো বড় কিছু নিয়ে লেখাপড়া করে মানুষের মতো মানুষ হবে।

কিন্তু সে আপত্তি পাত্তাই পেল না। তার স্বপ্ন, ইচ্ছা, অভিমতকে গুরুত্ব না দিয়ে তার বাবা বিয়ে ঠিক করলেন পাশের গ্রামের এক যুবকের সঙ্গে। বিয়ের আগের রাতে তাই অনেক কিছু ভাবল মণি—এত অল্পবয়সে তাকে বিয়ে দিচ্ছে বাবা-মা, অভিমানে ভরে যায় তার সমস্ত মন। বিয়ের দিন সকালে তাই বাড়ির আঙিনায় দড়ি দিয়ে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে হবিগঞ্জের গঙ্গানগর গ্রামের অভিমানী মেয়েটি!

সুফিয়া বেওয়ার বয়স পঁয়ষট্টি বছর। স্বামী মারা গেছে সেই কবেই। ফুল দেখলে তিনি আর এখন মুগ্ধ হন না, লাল শাড়ি দেখলে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন না, ঘরে প্রজাপতি এলে কোনো স্বপ্ন জাগান না মনে।

বিকেলের দিকে একদিন তার ঘরে সত্যি সত্যি একটা প্রজাপতি এলো। প্রজাপতিটি বেশ বড়। রাতেই তিনি শুনতে পান—তার আজ বিয়ে। এবং কোনো কিছু বোঝার আগেই বিয়েটা হয়ে যায় তার। রাজশাহীর কোনাবাড়িয়া গ্রামের সুফিয়া বেওয়া লাল শাড়ি পরে বাসরঘরে যান। ঘরে ঢুকেই তিনি দেখেন ফুল বিছানো বিছানায় বসে আছে নতুন স্বামী। চমকে ওঠেন তিনি তখনই। নিজেকে নিয়ে মনে প্রশ্ন জাগে, পঁয়ষট্টি বছরের সুফিয়া বেওয়ার স্বামী হাবিবুর রহমানের বয়স মাত্র আঠার কি উনিশ!

রাশীকের মুখে এ দুটো ঘটনা শোনার আগে তার কাছ থেকে আরেকটি ঘটনা শুনেছে ত্রিদিব। পাশে বসে শুনেছে মিতু এবং মিমিও। ত্রিদিব কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, 'আমরা বরং প্রথমে সোমার কাছেই যাই।'

'প্রথম যে ঘটনাটি বললাম, সে মেয়েটির কাছে?' রাশীক ত্রিদিবের দিকে তাকিয়ে বলল।

খুব ছোট্ট করে উত্তর দিল ত্রিদিব, 'হ্যাঁ।'

বাস থেকে নেমেই চারপাশটা একবার দেখে নিল রাশীক। মিতু, ত্রিদিব, মিমিও দেখল। কিশোরগঞ্জের তালডাঙ্গা গ্রামে অনেক তালগাছ নেই, তবু এ গ্রামের নাম তালডাঙ্গা। মুগ্ধ হয়ে গেল তারা গ্রামটা দেখে। চারদিকে কেবল সবুজ আর সবুজ।

সোমাদের বাড়িটা গ্রামের অনেক ভেতরে। ইট বিছানো রাস্তা পেরিয়ে ওরা যখন মাটির রাস্তায় পা রাখল, আশপাশের অনেক মানুষ তখন তাকিয়ে রইল অবাক চোখে। কিছুদূর যাওয়ার পর মিতু এক মহিলাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি জানেন, সোমাদের বাড়িটা আর কত দূর?'

ঘোমটা টেনে মহিলা বললেন, 'কোন সোমা?'

'ওই যে— ।'

কথাটা শেষ করতে পারল না মিতু। মহিলা তার আগেই বললেন, 'অ, সোমা। ওই তো আর কিছুদূর এগিয়ে গেলেই পেয়ে যাবেন।'

মহিলা তার আঙুল দিয়ে সামনের দিকটা দেখিয়ে দিলেন, ওরা সেই আঙুল বরাবর চলতে লাগল। এ পথটুকু আসতে নিয়ে ওরা আরো অনেককেই সোমার কথাটা জিজ্ঞেস করেছে। সোমাকে এ এলাকার সবাই চেনে।

সোমাদের বাড়ির সামনে এসে ওরা দেখল, বাহিরবাড়ির পাটখড়ির ঘরটা লাল-নীল কাগজ দিয়ে সাজানো আছে এখনো। সে ঘরের সামনে একটা মানুষ কাজ করছেন। ত্রিদিব এগিয়ে গেল তার দিকে, পেছনে পেছন ওরাও এগিয়ে গেল।

শহুরে পোশাক পরা এ চারজন ছেলেমেয়েকে দেখে কিছুটা চমকে উঠলেন করিম মৃধা। তারপর কিছুটা শঙ্কিত কণ্ঠে বললেন, 'কার কাছে এসেছেন আপনারা?'

'এখানে কি সোমা নামে কেউ থাকে?' মিমি মিষ্টি হেসে জিজ্ঞাসা করল লোকটাকে।

'হ্যাঁ।' কিছুটা অস্পষ্ট স্বরে বললেন করিম মৃধা।

'আপনি কি ওর বাবা?'

করিম মৃধা আগের মতোই বললেন, 'হ্যাঁ।'

মিতু পাটখড়ির বেড়ায় লাগানো লাল রঙের একটা কাগজ ধরে বলল, 'এগুলো কে লাগিয়েছে?'

'আমাদের বাড়ির পোলাপানরা লাগিয়েছে।' একটু হাসার চেষ্টা করলেন করিম মৃধা।

'ওরা খুব আনন্দ নিয়ে লাগিয়েছিল, না?' ত্রিদিব লোকটার পাশে বসতে বসতে বলে।

'এটা আপনি কী করছেন?' করিম মৃধা কিছুটা লাফিয়ে ওঠেন, 'আপনি মাটিতে বসেছেন, মানুষ বলবে কি! আমি মাদুর এনে দিচ্ছি।'

করিম মৃধা কথাটা বলেই বাড়ির ভেতর প্রায় দৌড়ে যাচ্ছিলেন। তার আগেই রাশীক তার একটা হাত ধরে বলল, 'তার দরকার হবে না। আমরা বরং আপনার এই ঘরটাতে বসি।' রাশীক লাল-নীল কাগজ লাগানো পাটখড়ির ঘরটা দেখাল।

বেশ ইতস্তত করে করিম মৃধা তার পাটখড়ির ঘরটাতে ঢুকলেন। ওরাও ঢুকল। একটা কাঠের চৌকি রয়েছে ঘরটাতে, আর কিছু নেই। তবে সমস্ত ঘরের ভেতরটা লাল-নীল কাগজের মালা দিয়ে সাজানো। আর পাটখড়ির বেড়াগুলো সিনেমার কাগজ দিয়ে ঢেকে দেওয়া। যেদিকে তাকানো যায়, শুধু সিনেমার নায়ক আর নায়িকা। কেউ নাচছে, কেউ হাসছে, কেউ আবার ফাইট করছে।

কাঁধের গামছা দিয়ে চৌকিটা মুছে দিয়ে করিম মৃধা বললেন, 'বসেন।'

মিতু একটু সরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আগে আপনি বসুন।'

নিজেকে খুব গুটিয়ে নিয়ে করিম মৃধা চৌকির এক কোনায় বসলেন। তার পাশে মিতু আর মিমি বসল। রাশীক জুতা খুলে চৌকির ওপর পা তুলে বসলেও ত্রিদিব আগের মতোই দাঁড়িয়ে রইল।

'সোমার বিয়ের টাকা কীভাবে জোগাড় করেছিলেন আপনি?' ত্রিদিব একটু এগিয়ে এসে করিম মৃধার সামনে দাঁড়াল।

চোখ তুলে করিম মৃধা ত্রিদিবের দিকে তাকালেন। ত্রিদিবের মনে হলো কথাটা তিনি বোঝেননি। সম্পূর্ণ স্থির হয়ে যাওয়া সে চোখের দিকে তাকিয়ে ত্রিদিব আবার বলল, 'বিয়ের টাকা আপনি কীভাবে পেলেন?'

স্বপ্ন দেখার পর ঘুম ভেঙে গেলে মানুষ যেমন করে তাকায় করিম মৃধা ঠিক সেভাবেই তাকালেন। তারপর খুব নিচু স্বরে বললেন, 'আমার কিছু জমি ছিল।'

'সেগুলো বিক্রি করে দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আংকেল—।' মিমি একটু সোজা হয়ে বসে বলল, 'আপনি খুব কষ্ট পেয়েছেন, না?'

'জমিগুলো আমার পোলা-মাইয়ার মতো ছিল। এক সন্তানকে বিক্রি করে আরেক সন্তানকে বিয়ে দিতে চেয়েছিলাম।' গলাটা যেন কেঁপে ওঠে করিম মৃধার।

'কত টাকা যৌতুক দেওয়ার কথা ছিল আপনার?'

'বিশ হাজার টাকা আর একটা টিউবওয়েল দেওয়ার কথা ছিল।'

'আর আপনি দিতে পেরেছিলেন ষোল হাজার টাকা আর টিউবওয়েল।' রাশীক খুবই শান্তভাবে কথাটা বলল।

'হ্যাঁ। বাকি ছিল চার হাজার টাকা।'

'সে কারণেই বরপক্ষের কেউ আসেনি।' ত্রিদিব বেশ গম্ভীর গলায় বলে, 'আর ভেঙে যায় আপনার মেয়ের বিয়ে।'

মাথাটা নিচু করে ফেলেন করিম মৃধা। একটু পর তিনি কেমন যেন নাক টানতে থাকেন। রাশীক দ্রুত তার মাথায় একটা হাত রেখে বলে, 'আংকেল, কাঁদছেন?'

'সে তো কয়েক দিন ধরেই কাঁদছি বাবা।'

বিকেল হয়ে গেছে। আশপাশের অনেক মানুষ কৌতূহলী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঘরের বাইরে। সবকিছু কেমন যেন শান্ত মনে হচ্ছে এ মুহূর্তে। মিমি ওর ওড়নাটা একটু টেনে নিয়ে বলল, 'সোমাকে কি একটু ডাকবেন আংকেল?'

কোনো কথা না বলে উঠে গেলেন করিম মৃধা। প্রায় পনের মিনিট পর তিনি যখন ফিরে এলেন, রাশীক, মিতু, ত্রিদিব, মিমি দেখল—ভেজা ভেজা চুলের একটা মেয়ে ঘরে ঢুকছে, তার হাতে একটা প্লেট, সে প্লেটের ওপর চারটি গ্লাস।

মিমি একটু উঠে বসে মেয়েটির হাত থেকে প্লেটটা নিয়ে চৌকির ওপর রাখল। তারপর ওর একটা হাত ধরে পাশে বসিয়ে বলল, 'তোমার নাম সোমা?'

মাথাটা নিচু করে ছিল সোমা। একটু উঁচু করে মিমির দিকে তাকিয়ে ও মৃদু স্বরে বলল, 'হ্যাঁ।'

'গ্লাসের এই শরবতগুলো কি তুমি বানিয়েছ?'

সোমা আগের মতো আস্তে করে বলল, 'হ্যাঁ।'

'তুমি আর কী করতে পার?'

কোনো কথা বলল না সোমা। মাথাটা নিচু করে সে বসে রইল। মিতু ওর মাথার চুলগুলো নাড়তে নাড়তে বলল, 'তুমি তো সব পার, না?'

'হ্যাঁ।'

'ভাত রাঁধতে পার, তরকারি রাঁধতে পার, কাপড় ধুতে পার, লেখাপড়াও তো কিছু করেছ বোধহয়, না?'

'হ্যাঁ।'

'এত কিছু পার, কিন্তু নিজেকে চিনতে পারনি?'

কিছুটা চোখ তুলে তাকাল সোমা। তারপর খুব বিষণ্ন কণ্ঠে বলল, 'সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে নিজেকে চিনতে পারা।'

অবাক হয়ে গেল মিতু। রাশীক এতক্ষণ মাথা নিচু করে ছিল, চোখ তুলে সে সোমার দিকে তাকাল। মিমি আর ত্রিদিব পরস্পর নিজেদের দিকে একবার তাকিয়ে কী যেন বলে নিল চোখে চোখে।

'নিজেকে চিনতে পারা যে সবচেয়ে কঠিন কাজ—এ কথাটা তুমি কীভাবে জানলে?' মিমি খুব আগ্রহ নিয়ে কথাটা বলল।

'আমার এক নানু ছিলেন, স্কুলে পড়াতেন। আমাকে দেখলেই তিনি কথাটা বলতেন।' সোমা আবার নিচু করে ফেলে মাথা, 'এত দিন কথাটা শুনে এসেছি, কয়েক দিন ধরে জানলাম, সত্যি নিজেকে জানা অনেক কঠিন কাজ।'

'এখন একটু একটু চিনতে পারছ?'

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে সোমা বলল, 'হ্যাঁ, একটু একটু চিনতে পারছি। তবুও—।'

'তবুও, কী?' রাশীক সোমার কাঁধে হাত রাখতে গিয়ে হাতটা ফিরিয়ে আনল।

'নিজেকে প্রায়ই অচেনা মনে হয়।' সোমার কথাটা কেমন যেন ভেজা ভেজা মনে হয় রাশীকের কাছে।

'তোমাকে যদি কোথাও নিয়ে যেতে চাই আমরা, যাবে?' মিতু সোমার একটা হাত ধরে বলে।

সোমা অস্পষ্ট স্বরে বলে, 'কোথায়?'

'যুদ্ধ করতে।'

কষ্টমাখা একটা হাসি দিয়ে সোমা মিতুর দিকে তাকায়। তারপর মুখটা ম্লান করে বলে, 'আমরা, আমাদের মতো গ্রামের মেয়েরা তো প্রতিনিয়তই যুদ্ধ করি আপু।'

'কিন্তু তোমার আসল যুদ্ধ বোধহয় শুরু হলো এখন থেকে।'

'আমারও তা-ই মনে হচ্ছে। বিয়ের আগের দিন আমার হাতে যখন মেহেদি লাগিয়ে দেওয়া হয়, তখন একটা স্বপ্ন ছিল আমার। বিয়ের দিন সকালে যখন আমাকে বিয়ের শাড়ি পরিয়ে দেয়, আরেকটা স্বপ্নের কথা আমি তখন ভাবতে

থাকি। বিয়ের পার্টিতে বসে আমি যখন আমার অনাগত সুখের কথা ভাবছিলাম, তখন যোগ হয় আরেকটা স্বপ্ন।' কিছুটা উদাস স্বরে সোমা বলে, 'এখন আর আমার কোনো স্বপ্ন নেই।'

'তুমি কাঁদছ?' মিমিও যেন কেঁদে ফেলবে।

'না আপু, কাঁদছি না। কষ্ট হচ্ছে তো। যতবার আমি আমার হাতের দিকে তাকাই ততবার কষ্ট পাই।'

'দেখো—।' মিমি সোমার হাতটা উল্টে দেখে বলে, 'তোমার হাতের এই মেহেদির দাগ একদিন মুছে যাবে।'

'জানি আপু।' সোমা কণ্ঠটা আরো বিষণ্ন করে বলে, 'মেহেদির দাগ নাহয় একদিন মুছে যাবে, কিন্তু বুকের ভেতর যে একটা দাগ পড়ে গেছে, সেটার কী হবে আপু?'

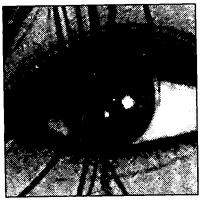

ঘুমটা ভেঙে গেল হঠাৎ। কিন্তু কেন ভেঙে গেল, তা বুঝতে পারল না রাশীক। কিছুক্ষণ সেভাবেই চুপচাপ শুয়ে রইল সে এবং একসময় বুঝতে পারল তার ঘুম ভাঙার কারণ। গ্রাম থেকে তার যে এক দাদা এসেছেন, নামাজ পড়ছেন তিনি।

বিছানায় উঠে বসল রাশীক। খাটের পাশের জানালার পর্দাটা সরিয়ে বাইরে তাকাল সে। বাইরে অন্ধকার। কোনো কোনো মসজিদে ফজরের আজান হচ্ছে এখনো।

ড্রইংরুমের বারান্দায় এসে রাশীক দেখল, একদম চুপচাপ, কোথাও কোনো শব্দ নেই। ঝিরিঝিরি বাতাসগুলো গায়ে মেখে তার পবিত্রতাই ঘোষণা করছে, প্রকৃতি ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চুপ, মৌন আকাশটা চেয়ে আছে অপলক চোখে। অথচ আর একটু পরেই সমস্ত পবিত্রতাকে খুবলে ফেলে কোনো নির্লজ্জ ঘুষখোর হাত পেতে ঘুষ নেবে, কোনো খুনি নতুন আরেকটা খুনের প্রস্তুতি নেবে, কোনো চরিত্রহীন কারো সর্বনাশের জন্য নতুন কোনো পথ খুঁজবে, কোনো ক্ষমতাবান তার স্বার্থের জন্য অন্যকে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করবে কিংবা দেশের নেতা-নেত্রীরা প্রতিদিনের মতো তাদের পারস্পরিক ঝগড়ার মহড়া দেবে—এ দেশটা তাদের ড্রইংরুম আর আমাদের পবিত্র দেশের এ পবিত্র মাটি তাদের বাপ-দাদার সম্পত্তি।

'রাশীক।'

কিছুটা চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়াল রাশীক। নামাজ শেষ করে তার সেই দাদা কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন টেরই পায়নি সে।

'প্রতিদিন তুমি কি এত সকালেই ঘুম থেকে ওঠো?' কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত একটা হাসি দিলেন দাদা।

'না, মাঝে মাঝে উঠি।' রাশীকও হাসার চেষ্টা করল।

'প্রতিদিন নয় কেন?' দাদা আবার হাসলেন।

রাশীক সে প্রশ্নের উত্তর দিল না। মুচকি হেসে একটু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে

বলল, 'আপনি তো কোনো একটা কাজে এসেছেন।'

'হ্যাঁ।'

'কাজটা কী—আমি কি তা জানতে পারি?'

'অবশ্যই। দু বছর আগে আমি অবসর নিয়েছি, কিন্তু পেনশনের একটা টাকাও পাইনি এখনো।' কিছুটা দুঃখী দুঃখী গলায় বললেন দাদা।

'দু বছর হয়ে গেছে, অথচ একটি টাকাও পাননি!' রাশীক বেশ আশ্চর্য হয়ে গেল, 'আপনি কী চাকরি করতেন দাদা?'

'শিক্ষক ছিলাম আমি। সরকারি প্রাইমারি একটা স্কুলে শিক্ষকতা করতাম।'

রাশীক মাটির দিকে তাকিয়ে ছিল, ঝট করে সে তার দাদার মুখের দিকে তাকাল। ব্যাপারটা টের পেলেন দাদা। আগের মতোই হাসতে হাসতে দাদা বললেন, 'অবাক হয়েছ মনে হয়?'

'না, অবাক হইনি। একজন শিক্ষকের মুখ দেখলাম।'

'কোনো শিক্ষককে আগে কখনো দেখনি!'

'দেখেছি।'

'তাহলে?'

'না, ঠিক আছে।'

'তুমি কি কোনো কিছু লুকাচ্ছ রাশীক?'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ থেকে রাশীক বলল, 'কুষ্টিয়ায় ভেড়ামারা স্কুলের এক শিক্ষিকা আছিয়া খাতুন আট বছরের এক ছাত্রী নাফিসা খানম অনন্যাকে পিটিয়েছে এবং তার মাথার চুল টেনে তুলে ফেলেছে।'

'কেন?' দাদা একটু ঝুঁকে আসেন রাশীকের দিকে।

'আছিয়া খাতুন চতুর্থ শ্রেণীতে ক্লাস নিচ্ছিলেন। পাশের তৃতীয় শ্রেণীতে কোনো শিক্ষক না থাকায় গল্পগুজব করছিল ছাত্রছাত্রীরা। হয়তো তাতে বেশ শব্দ হচ্ছিল। আছিয়া খাতুন সেটা থামাতে তৃতীয় শ্রেণীতে আসতেই সবাই দৌড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু সামনে পেয়ে যান অনন্যাকে। তারপর তাকে প্রচণ্ড মার দেন তিনি এবং একসময় মাথার চুলের মুঠি ধরে অনেকগুলো চুল তুলে ফেলেন।'

'এটা কী করে সম্ভব!'

'হ্যাঁ সম্ভব। অনন্যা এখন অসুস্থ হয়ে পড়েছে এবং সে জানিয়ে দিয়েছে সে আর কোনো দিন স্কুলে যাবে না।' রাশীক ম্লান হেসে বলে, 'দাদা, কষ্ট পেলেন?'

চোখ দুটো ছলছল করে দাদার বললেন, 'কষ্টের কথা না!'

'ভোলার মেদুয়া গ্রামের এক মাদ্রাসার শিক্ষক সামান্য পড়া না পারার

কারণে আছাড় দিয়ে মেরে ফেলেছে রাসেল নামের সাত বছরের এক ছাত্রকে। চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলাতে ভানুমতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র সাজ্জাতুল ইসলাম স্কুল থেকে বাড়ি গিয়েছিল শিক্ষককে না বলে। এ জন্য ক্লাসের শিক্ষক ঝর্না দত্ত তার গলায় স্যান্ডেল ঝুলিয়ে দু হাতে কান ধরিয়ে পুরো স্কুল ঘুরিয়েছে তাকে।' রাশীক একটু থেমে বলে, 'দাদা, আরো শুনবেন?'

'না।'

'আর একটামাত্র ঘটনা বলব আপনাকে। মিতু নামে আমার এক আত্মীয় আছে। ও একদিন ওর শিক্ষক-বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'একজন বাবা হিসেবে তোমাকে আমি কোন স্তরে ফেলব বাবা?'

মিতুর বাবা বলেছিলেন, 'অবশ্যই ভালো স্তরে।'

'আমি জানি, কিন্তু তোমাকে যদি বলি মানুষ হিসেবে?' মিতু ওর বাবাকে জিজ্ঞেস করে।

'তুমি এটাও জানো, ভালো-মন্দ নিয়েই মানুষ।'

'বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিদিন পড়াতে তোমার কেমন লাগে বাবা?'

'মাঝে মাঝে প্রচণ্ড একঘেয়েমি লাগে।'

'সেটা বয়সের জন্য?'

'হতে পারে, অনেক দিন ধরেই তো পড়াচ্ছি।'

'আগে কেমন লাগত?'

'চমৎকার।'

'কেন চমৎকার লাগত?'

'ঠিক জানি না।'

'আমি কিন্তু জানি বাবা।'

'বলো।

'না। আচ্ছা তুমি এই একঘেয়েমির কাজটা তো আরেক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়েও করো।'

'হ্যাঁ, ওরা এত জোর করে ধরল।'

'এটা কি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ জানে?'

'হয়তো।'

'তুমি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছ, এতে কি এই বিশ্ববিদ্যালয়কে ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে না?'

'হ্যাঁ, তা হচ্ছে।'

'তুমি তো একটা কোম্পানিতে কনসালটেন্সিও কর।'

'হ্যাঁ, এ রকম অনেকেই করে।'

'ওরা তোমাকে অনেক টাকা বেতন দেয়, তাই না বাবা?'

'হ্যাঁ।'

'ওরা তো তোমাকে প্রায়ই বিদেশে পাঠায়।'

'প্রয়োজন হয় যে মা।'

'এই যে তুমি এত টাকা রোজগার করছ, কার জন্য বাবা?'

'কেন, তোমার জন্য।'

'আমার তো এত টাকার প্রয়োজন নেই বাবা, আর আমি তো লেখাপড়া শিখছি, আমিও তো একদিন রোজগার করব।'

'প্রত্যেকটা ছেলেমেয়েই রোজগার করে একদিন, তবু বাবারা তাদের দায়িত্ব পালন করে।'

'একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করব বাবা?'

'বলো।'

'মা তোমাকে ছেড়ে চলে গেল কেন?'

'ব্যাপারটা আমি তোমাকে বলতে চাইছি না।'

'খুবই ব্যক্তিগত?'

'সেটাও বলতে চাইছি না, আমরা বরং তোমার লেখাপড়া নিয়ে কথা বলি।'

'ওকে বাবা।'

'অনার্সে তো তুমি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছ, মাস্টার্সটা কেমন হবে?'

'সেটা নির্ভর করছে সম্পূর্ণ আমার ওপর বাবা।'

'হ্যাঁ, রেজাল্ট তো প্রতিটা ছেলেমেয়ের ওপরই নির্ভর করে।'

'আমারটা অন্যরকম বাবা।'

'বুঝলাম না।'

'তার জন্য তোমার কাছে এসেছি বাবা।'

'ব্যাপারটা খুলে বলো তো।'

'মা তোমাকে ছেড়ে কেন চলে গেছে, এটা কিন্তু আমি জেনে গেছি বাবা।'

'কী জেনেছ?'

'তোমার এক ছাত্রীকে ফার্স্ট করার বিনিময়ে তুমি সে মেয়েটিকে ব্যবহার করেছিলে, মা এটা জেনে ফেলেছিল।'

'তোমাকে ওসব কে বলল?'

'তুমি তো আমাকে কখনো মিথ্যে বলো না বাবা, তুমি তো আমাকে মিথ্যে

বলতে শেখাওনি। বলো না বাবা।'

'তোমার মা ফোন করে এসব জানিয়েছে তোমাকে?'

'মাকে এত ছোট ভাবলে কেন বাবা?'

'না... ইয়ে...।'

'বাবা, আমি প্রচণ্ড একটা সমস্যায় পড়েছি।'

'তুমি বলো আমাকে, পৃথিবীতে এমন কোনো সমস্যা নেই, যা আমি সমাধান করতে পারব না। বলো, কত টাকা লাগবে?'

'টাকা দিয়ে এ সমস্যার সমাধান হবে না বাবা।'

'কী দিয়ে হবে, বলো?'

'বাবা...।'

'থামলে কেন, বলো।'

'বাবা...।'

'আহ্ থামছ কেন, বলো!'

'আমার ভীষণ লজ্জা করছে বাবা।'

'তুমি আমার দেহের অংশ, আমার কাছে তোমার লজ্জা কেন মা?'

'তবুও বাবা।'

'সব ঝেড়ে ফেলে তুমি বলো, নিঃসংকোচে বলো।'

'বাবা, আমি মাস্টার্সেও ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হতে পারব বাবা।'

'তো?'

'যদি...।'

'আবার থামলে কেন?'

'যদি আমি আমাদের ডিপার্টমেন্টের স্যারের কথায় রাজি হই।'

'কী বললে!'

'তোমাকে কি আরো খুলে বলতে হবে বাবা?'

'না।'

'তাহলে এবার একটি প্রশ্নের জবাব দাও—একটি মেয়ের কাছে তার রেজাল্ট বড়, না তার সতীত্ব বড়। বাবা, আমি জানি তুমি এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে না, কখনোই পারবে না। বাবা, তোমার মনে আছে, ছোটবেলা তোমার আঙুল ধরে বেড়াতাম, তোমার কোলে বসে রিকশায় চড়ে স্কুলে যেতাম, মাঝে মাঝে ভীষণ ভয় করলে তোমার বুকে গিয়ে আছড়ে পড়তাম, পরম নির্ভরতা আর মমতায় তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরতে। বাবা, আমার আজ প্রচণ্ড ভয় করছে, কিন্তু তোমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে আমার ভয় করছে আরো বেশি। বাবা,

আজকে অন্তত এ প্রশ্নটার জবাব দাও—দেশের সবচেয়ে বড় বিদ্যাপীঠের কিছু কিছু শিক্ষক এমন কেন, কেন তারা রাস্তার একটি প্রাণীর চেয়েও নিম্নস্তরের!

তুমি কাঁদছ? স্যরি বাবা, আই অ্যাম এক্সট্রেমলি স্যরি।'

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে রাশীক দাদার দিকে তাকাল। মাথাটা নিচু করে ফেলেছেন দাদা। রাশীক একটু এগিয়ে গিয়ে দাদাকে বলে, 'দাদা, মিতুর আর পরীক্ষা দেওয়া হয়নি।'

খুব কষ্টমাখা চেহারা নিয়ে দাদা মাথাটা তুলে রাশীকের দিকে তাকালেন, তারপর রাশীকের কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন, 'এ রকম মানুষের সংখ্যা খুব কম রাশীক।'

'আমি জানি। কিন্তু এ রকম খারাপ মানুষগুলোই তো আমাদের মাথার ওপর বসে আছে। তাদের কেউ দেশসেবার নামে নিজেদের ব্যাংক ব্যালান্স বাড়াচ্ছে, প্রতিপত্তি বাড়াচ্ছে, বাড়াচ্ছে দেহের আয়তন এবং ওজনও। কিন্তু আমরা কিছুই করতে পারি না। তাদের মনুষ্যত্বহীনতা দেখে আমরা কাঁদি, তাদের পাশবিকতা দেখে আমরা ভয়ে কুঁকড়ে যাই, তাদের নির্লজ্জতা দেখে আমরা নিজেরা লজ্জা পাই।'

'সত্য, খুব সত্য কথা।'

'আচ্ছা দাদা—।' রাশীক দাদার একটা হাত খামচে ধরে বলে, 'যদি এ খারাপ মানুষগুলোকে—।'

কথাটা শেষ করে না রাশীক। পূর্বাকাশ লাল হয়ে উঠেছে। নাগরিক এই শহর থেকে বিতাড়িত হওয়ার পরও যে কয়েকটা পাখি এখনো টিকে আছে, তাদের দু-একটা শিস বাজাচ্ছে। ধূসর অন্ধকার দূর হয়ে যাচ্ছে। অবিশ্বাস্য সৌন্দর্য নিয়ে লাল টকটকে গোল সূর্যটা উঁকি দিয়েছে।

রাশীক তবু দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল!

দাদু ঘরে ঢুকেই বললেন, 'রাশীক, ঘরে আছিস?'

জানালা থেকে সরে এসে রাশীক দাদুর একটা হাত ধরল। দাদু রাশীকের মুখে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'খেয়েছিস?'

'না।'

'কেন?'

'খেতে ইচ্ছে করছে না।'

'এত বেলা হলো এখনো খিদে লাগেনি?'

'তুমি খেয়েছ দাদু?'

'না, আজ রোজা রেখেছি তো।'

'কিসের রোজা দাদু?'

'কিসের আবার, আমি তো মাঝে মাঝেই রোজা রাখি।'

রাশীক দাদুর হাতটা চেপে ধরে বলে, 'এই যে এত পুণ্য হচ্ছে তোমার, তোমার সে পুণ্য থেকে আমাকে একটু দেবে?'

দাদা হাসতে হাসতে বলে, 'কেন?'

'অযাচিত পাপ যার জন্মের উৎস, তার তো একটু পুণ্যের দরকার দাদু।'

ঝট করে মুখ তুলে তাকালেন দাদু। কী অদ্ভুত! মাত্র এক মুহূর্তেই চোখ দুটো ভিজে উঠেছে তার। রাশীকের দিকে আবার হাত বাড়িয়ে তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'ভুলে যা দাদু, ওসব কথা একদম ভুলে যা।'

'সে তো অনেক দিন ধরেই চেষ্টা করছি। যদি পারতাম!'

'একটু আগে তোর বাবা তোকে ডেকেছিল, গিয়েছিলি?'

'না।'

'কেন?'

'নীতিকথা শুনতে ভালো লাগে দাদু, কিন্তু নীতিহীনের মুখে সে কথা শুনতে বড্ড ঘৃণা হয়।'

'তবুও তো বাবা—।' কথাটা বলেই দাদু রাশীকের দিকে তাকালেন। রাশীক দেখতে পায়, দাদুর চেহারায় কেমন যেন ভুল বলার ছোঁয়া। হয়তো তা সংশোধন করতেই দাদু পরক্ষণেই বলেন, 'আজও কি মানুষ খুঁজতে যাবি?'

রাশীক দাদুর চিকচিকে সোনালি চুলগুলো নেড়ে বলে, 'হ্যাঁ দাদু।'

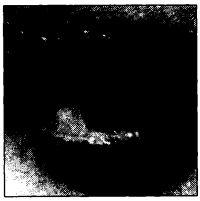

কথাটা শুনে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল ত্রিদিব। নিজেকে এ মুহূর্তে প্রচণ্ড অপরাধী মনে হলো তার। ছলছল চোখে সে আগের মতোই অবাক কণ্ঠে বলল, 'মেয়েটা আত্মহত্যা করল!'

রাশীক অস্পষ্ট সুরে বলল, 'হ্যাঁ।'

কখনো দুবেলা খাবার জুটত না দীপালিদের। তাদের পরিবারের সবাই পালা করে খেত। যারা দুপুরে খেত, তারা রাতে খেতে পেত না; যারা রাতে খেত, তারা সকালে খেতে পেত না। সেই ধারাবাহিকতায় গত সোমবার দুপুরে দীপালির খাওয়ার কথা ছিল আর তার ছোট ভাই বিপ্লবের খাওয়ার কথা ছিল রাতে। কিন্তু রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারেনি প্রতিবন্ধী বিপ্লব, বড় বোন দীপালির খাবারটুকু খেয়ে ফেলে সে। না খেয়ে থাকায় অভ্যস্ত দীপালি সন্ধ্যা পর্যন্ত না খেয়েও ছিল। কিন্তু একসময় প্রচণ্ড ক্ষুধার কষ্টের কাছে পরাজিত হয়ে যায় কিশোরগঞ্জের ভরাডুল নাথের মেয়ে উনিশ বছরের দীপালি। গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে চলে যায় সে ক্ষুধা-তৃষ্ণার ঊর্ধ্বে!

মিমি আর মিতু কেমন যেন কুঁকড়ে যায়। কোনো কথা খুঁজে পায় না তারা। একটু পর মিমি কাঁপা কাঁপা গলায় বলে, 'মানুষ এখনো না খেয়ে থাকে!'

সঙ্গে সঙ্গে মিতু বলল, 'মানুষ না খেতে পেরে আত্মহত্যা করে!'

'তোরা অবাক হচ্ছিস?' রাশীক ম্লান হাসে। তারপর বলে, 'বাহাত্তর বছর বয়সেও ঘরের বাইরে বের হন আফতাব আলী।'

মিমি একটু ঝুঁকে এসে বলে, 'কেন?'

'খাবারের খোঁজে।

'খাবরের খোঁজে!' মিতু কিছুটা শব্দ করে বলে।

'তবে ভাত, মাছ, পোলাও, বিরিয়ানির খোঁজে না। হেলেঞ্চা, কলমিশাক তোলার জন্য ডোবা, নর্দমায় নেমে পড়েন তিনি। এ শাকপাতা সেদ্ধ করেই ক্ষুধা মেটান গাইবান্ধা জেলার কামারজানী গ্রামের বৃদ্ধ আফতাব আলী। আরো

শুনবি?' রাশীক মিমি, ত্রিদিব, মিতুর দিকে তাকায়।

মিতু খুব নুয়ে গিয়ে বলে, 'আরো আছে?'

'আছে। বিরাশি বছরে শরীরের সমস্ত চামড়া ঝুলে গেছে তার। হাতের আঙুলগুলো এত সরু হয়ে গেছে যে, আলতো করে ধরলেই যেন সেগুলো মট করে ভেঙে যাবে। ঘোলাটে চোখ তার, তার চেয়েও ঘোলাটে পাওয়ারফুল চশমা। হাঁটেন লাঠিতে ভর দিয়ে। শীর্ণ দেহ নিয়ে তিনি প্রতিদিন তিন মাইল হেঁটে চলে যান তার বর্তমান কর্মক্ষেত্রে। তিনি ইট ভাঙেন এবং এই ইট ভাঙার মতো অমানুষিক পরিশ্রম করেই পেটের খাওয়া যোগান রংপুরের বামনডাঙ্গা গ্রামের আলিমন নেছা।

'আমরা কি এবার এদের কারো কাছে যাব?' ত্রিদিব খুব বিষন্ন কণ্ঠে বলে।

'না।'

'তাহলে?' মিমি ওর মাথার চুলগুলো টেনে বাঁধতে বাঁধতে বলে।

'আমরা এবার অন্য একটা জায়গায়, অন্য এক মানুষের কাছে যাব। ক্ষুধা লাগলে যিনি অন্য কিছু করেন।'

রাশীক, মিতু, ত্রিদিব, মিমি অনেকক্ষণ ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। ধীরেন্দ্র বর্মণের বাড়ির সামনে একটা বাঁশ টাঙানো আছে, সে বাঁশে একটা জাল ঝুলছে, মাছ ধরার জাল। বেশ কিছুক্ষণ পর দশ-বারো বছরের একটা ছেলে এসে জালটা নিজের হাতে নিল। তারপর মাথা তুলে তাকাতেই দেখতে পেল রাশীকদের।

রাশীকরা এগিয়ে গেল ছেলেটার দিকে। ত্রিদিব ছেলেটার জাল স্পর্শ করে বলল, 'তুমি নিশ্চয় নির্মল?'

ছেলেটা অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল, ত্রিদিবের কথা শুনে ও আরো অবাক হয়ে যায়, কিন্তু কোনো কথা বলে না।

মিমি একটু এগিয়ে এসে বলে, 'তোমার নাম কি নির্মল বর্মণ?'

ছেলেটি এবার একটু নড়েচড়ে দাঁড়ায়। বলে, 'জি।'

'এ জাল নিয়ে তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'মাছ ধরতে।'

'কোথায় যাও মাছ ধরতে?'

'এই খাল-বিল-নদীতে।'

'মাছ পাওয়া যায় কেমন?'

'খুবই অল্প।'

রাশীক একটু এগিয়ে আসে। তারপর নির্মলের মাথায় একটা হাত রেখে বলে, 'এ মাছ থেকে দিনে কত টাকা পাও তুমি?'

'ত্রিশ টাকাও হয়, কোনো দিন চল্লিশ টাকাও হয়।'

'তোমার স্কুলে যেতে ইচ্ছে করে না?'

'না।'

'কেন?'

'লেখাপড়া করলে তো মাছ ধরতে পারব না।'

'মাছ ধরাটা কি তোমার খুবই জরুরি?'

'হ্যাঁ, এই মাছ বিক্রির টাকা দিয়েই তো আমাদের সংসার চলে।'

মিতু এগিয়ে আসে নির্মলের কাছে, 'এই ত্রিশ-চল্লিশ টাকা দিয়ে সংসার চলে কীভাবে?'

'তা তো জানি না। সংসার তো চালান বাবা। আমি মাছ বিক্রি করে সব টাকা বাবার হাতে তুলে দিই, তারপর বাবা সংসার চালান।'

'তোমার কষ্ট হয় খুব, না?' মিতু কেমন যেন হয়ে যায় কথাটা বলতে বলতে।

'খুব কষ্ট।'

'তোমার অন্য কিছু করতে ইচ্ছে হয় না?'

'অন্য আর কী করব?'

নির্মলের এ প্রশ্নটার জবাব কেউ দিতে পারে না। রাশীক মাথাটা নিচু করে কী যেন ভাবছে, ত্রিদিব তাকিয়ে আছে অন্যদিকে। মিমি ওড়না দিয়ে মুখটা ঢেকে ফেলেছে, মিতু অপলক চোখে তাকিয়ে আছে নির্মলের দিকে।

বেশ কিছুক্ষণ পর ত্রিদিব বলে, 'তোমার বাবা আছেন বাড়িতে?'

'জি আছেন।'

'কী করেন?'

'বাবা শুয়ে আছেন।'

'এখনো শুয়ে আছেন!'

'বাবা ঠিকমতো দাঁড়াতে পারেন না তো।'

'কেন?'

'দুদিন ধরে বাবা না খেয়ে আছেন।'

'কেন?' রাশীক কিছুটা চিৎকার করে বলে।

'গত দুদিন আমার জ্বর হয়েছিল তো, তাই মাছ ধরতে পারি নাই।'

মিমি শব্দ করে কেঁদে ওঠে। আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকতে ঢাকতে ও রাশীকের একটা হাত খামচে ধরে বলে, 'এ তুই কোথায় নিয়ে এলি রাশীক, প্লিজ, আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল!'

রাশীক মিমির হাতটা ধরে খুব নরম গলায় বলে, 'আমরা তো মানুষ খুঁজতে এসেছি মিমি।'

রাশীকের হাত থেকে ঝটকা দিয়ে নিজের হাতটি ছাড়িয়ে নিয়ে মিমি বলে, 'কী হবে মানুষ খুঁজে। আমরা কী করতে পারব এসব মানুষের জন্য?'

'অনেক কিছু।'

'প্রতিদিন প্রতিটি মন্ত্রীর শরীরের চর্বি বাড়ছে, কালোবাজারিরা কালো টাকার পাহাড় বানাচ্ছে, প্রত্যেকটি রাজনীতিবিদ আপসের রাজনীতি করছে, যার যার মতো এ দেশটাকে খুবলে খুবলে খাচ্ছে—আর তুই বলছিস, আমরা অনেক কিছু করতে পারব?'

মিমির মাথায় হাত রেখে রাশীক আরো শান্তভাবে বলে, 'দেখিস, আমরা আজ যা শুরু করব, একদিন অন্যরা তা শেষ করবে।'

নাক টেনে টেনে কাঁদতে কাঁদতে মিমি বলে, 'আমার খুব কষ্ট হচ্ছে রে, সারা দেশে এত মানুষ না খেয়ে থাকে, আর আমরা কিছুই জানি না। কী করেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি?'

'প্রধানমন্ত্রী প্রতিদিন মাইকে উন্নয়নের জোয়ারের কথা বলেন, আর আমাদের রাষ্ট্রপতি এটা-ওটা উদ্বোধন করে বেড়ান। তা ছাড়া তাদের তো কাজ দেখি না আমরা।'

ত্রিদিব, মিমি, মিতু, রাশীক হঠাৎ তাকিয়ে দেখে, সামনের ঘর থেকে একটা বৃদ্ধ লোক বের হয়ে আসছেন তাদের দিকে। তার হাতে একটা লাঠি। ঠিকমতো হাঁটতে পারছেন না তিনি। রাশীক কিছুটা দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরতেই লোকটা সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়লেন মাটির ওপর। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'বাবারা, আপনারা কারা?'

রাশীক লোকটার লাঠিটা পাশে রেখে দিয়ে বলল, 'আপনার নাম তো ধীরেন্দ্র বর্মণ, আমরা আপনাকে দেখতে এসেছি।'

'আমাকে দেখতে এসেছেন আপনারা! আমি তো এখন একজন কঙ্কাল বাবা।'

ত্রিদিব আস্তে আস্তে লোকটার সামনে বসে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে মিমি আর মিতুও বসে পড়ে মাটিতে। ধীরেন্দ্র বর্মণ অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন ওদের দিকে। একটু পর ত্রিদিব খুব আন্তরিকভাবে বলে, 'কাকা, আপনার বয়স কত?'

'সত্তর।' খুব সংক্ষিপ্ত উত্তর দেন ধীরেন্দ্র বর্মণ।

'নির্মল তো আপনার ছেলে, না?'

'হ্যাঁ, আমার অন্নদাতা।'

'এখন আর খালে-বিলে মাছ পাওয়া যায় না, আপনি এখনো কেন মাছ ধরার কাজ করেন?'

'বাপ-দাদারা করত তো।' হাঁপাতে হাঁপাতে ধীরেন্দ্র বর্মণ বলেন, 'দাঁড়াতে পারি না। যদিও আমি এখন আর জাল টানতে পারি না, ওই মাসুম ছেলেটাই এখন সব করে।' ধীরেন্দ্র বর্মণ সামনে দাঁড়ানো নির্মলের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'ও না থাকলে আমরা বোধহয় মরেই যেতাম!'

'আপনি কি বেঁচে আছেন?' মিমি প্রচণ্ড রাগ নিয়ে কথাটা বলে।

খুব ধীরে ধীরে ধীরেন্দ্র বর্মণ মিমির মুখের দিকে তাকান। তারপর অল্প একটু হেসে বলেন, 'না মা, মরে তো সেই কবেই গেছি। কিছু পাপ এখনো বোধহয় বাকি আছে, সেটা কাটাতেই হয়তো এভাবে বেঁচে থাকা।'

'আপনার কষ্ট দেখে আমাদের কষ্ট হচ্ছে, আমাদের চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করছে।'

'কেন মা?'

'এই যে, না খেয়ে থাকেন আপনি, আপনার কষ্ট হয় না?'

'না মা, এখন আর সত্যি সত্যি কষ্ট হয় না।' হাড্ডিসার দেহ কাঁপিয়ে কিছুটা হাসার চেষ্টা করেন ধীরেন্দ্র বর্মণ, তারপর বলেন, 'এখন খিদে লাগলে ভগবানকে ডাকি। বলি, ভগবান, আমার পেট ভরে দাও। আমার সন্তানরা এখনো কিছু খায়নি। সন্তানদের রেখে আমি খেতে পারব না।'

ধীরেন্দ্র বর্মণ কিছুটা চিৎকার করে কথাগুলো বলেন। কিন্তু রাশীকরা জানে– এ চিৎকার ভগবানের দরবারে পৌঁছাবে না কখনো। কারণ, অনেক দিন ধরেই ভগবানের উদ্দেশে এভাবে চিৎকার করে আর্তি জানানো হয়, ভগবান তা শোনেন না। ভগবান বধির, তাই কানে শোনেন না; ভগবান অন্ধ, তাই চোখে দেখেন না। সম্ভবত অন্যের দুঃখে ভগবানের তাই কোনো কষ্টও হয় না!

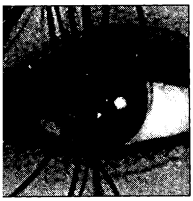

মোবাইলের বাটন টিপে মিতু বেশ উত্তেজিত হয়ে পায়চারি করতে লাগল। ওপাশে মোবাইলের রিং বাজছে, কিন্তু ফোন ধরছে না রাশীক। কয়েকবার এ রকম হওয়ার পর রাশীক ফোনটা রিসিভ করতেই মিতু অস্থির গলায় বলল, 'রাশীক, একটা ঘটনা ঘটেছে রে।'

ঘুমজড়িত কণ্ঠে রাশীক বলল, 'কী?'

'কিরে, তুই ঘুমাচ্ছিস নাকি?'

'না, একটু শুয়ে ছিলাম।' রাশীক দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'বল, কী হয়েছে?'

'তুই কি এখনই একটু বের হতে পারবি?'

'কেন?'

'একটা ক্লিনিকে যেতে হবে।'

'ক্লিনিকে?' রাশীক বিছানা থেকে উঠে বসে।

'হ্যাঁ, অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটেছে।'

'ত্রিদিব-মিমিকে জানিয়েছিস?'

'হ্যাঁ, ওরা এখনই আমার বাসায় চলে আসবে।' মিতু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'তুই কি আমার বাসায় আসবি, না সরাসরি ক্লিনিকে চলে যাবি?'

'আমি বরং ক্লিনিকেই চলে যাই, তুই ক্লিনিকের ঠিকানাটাই বল।'

মিতু ক্লিনিকের ঠিকানা বলল, রাশীক লিখে নিল সেটা। আধঘণ্টা পর ওরা যখন ক্লিনিকে পৌঁছল, তখন দেখল, ক্লিনিকের ভেতর অনেকগুলো মানুষ জটলা পাকিয়ে আছে। রাশীক একটা নার্সকে জিজ্ঞাসা করল, 'এত ভিড় কেন ম্যাডাম?'

নার্স কিছুটা অবাক হয়ে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'কই ভিড়, প্রতিদিন তো এরকমই হয়।'

রাশীকও হাসল এবং মনে মনে বলল, 'যাক, দেশের এ সেক্টরটা অন্তত

লাভজনকভাবে ব্যবসা করছে।'

'দুই শ বারো নম্বর রুমটা কোন দিকে?' আরেক নার্সকে জিজ্ঞাসা করল রাশীক।

'দোতলার ডান কোনার দিকে।'

দুই শ বারো নম্বর রুমে এসে ওরা দেখল, এখানেও অনেক ভিড়। মিতু ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকে রাশীক, ত্রিদিব, মিমিকে ডাকল। ওরা ভেতরে ঢুকে দেখল— একটা মহিলা শুয়ে আছেন বেডে, পাশে ছোট্ট একটা বাচ্চা। মহিলাটার পাশে এক ভদ্রলোক বসা।

'মামা, ওরা হচ্ছে রাশীক, ত্রিদিব আর মিমি। আমার বন্ধু।'

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন।

রাশীক একটু এগিয়ে গিয়ে বলল, 'মামা, এখন কী অবস্থা?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'মামীর পেটব্যথা কি বেশি?'

'খুবই বেশি। একটু এপাশ-ওপাশ হলেই ব্যথাটা আরো বাড়ে।'

'যে ডাক্তার অপারেশন করেছেন, তিনি কোথায়?'

'বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।'

'উনি কিছু করছেন না?'

'করতে চেয়েছেন, কিন্তু আমরা করতে দিইনি।'

'ব্যাপারটা আসলে কী, একটু খুলে বলেন তো মামা।'

মামার চোখ-মুখ লাল হয়ে আছে। তিনি কথা বলতে নিয়ে কেমন যেন তোতলাচ্ছেন। বেশ কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর তিনি বললেন, 'সকাল আটটার সময় তোমাদের মামীকে ক্লিনিকে ভর্তি করাই। প্রচণ্ড পেটব্যথা, কিন্তু ডাক্তার আসেন প্রায় সাড়ে নয়টায়। এসেই তাড়াহুড়ো করে অপারেশন করেন তোমার মামীকে। ডাক্তার একটু ভালো করে দেখলেন না যে, ডেলিভারিটা নরমালভাবে করা যেত কি না।'

'আজকাল অনেক জায়গাতেই এমন হচ্ছে।' মিমি একটু গম্ভীর হয়ে বলল।

'মামীর তাহলে সিজারিয়ান ডেলিভারি হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'মামা, তারপর?'

'অপারেশন করেই ডাক্তার চলে যান। রোগীকে ভালো করে না দেখেই সোজা চলে যান অন্য এক ক্লিনিকে।'

'অন্য ক্লিনিকে কেন?'

'ওখানেও আরেকটা ডেলিভারি কেস ছিল।'

'একটা ডাক্তার একই সময় কয় জায়গায় কাজ করবেন, এটা তো ভীষণ বিপজ্জনক!' ত্রিদিব মিমির মতোই গম্ভীর গলায় বলল।

'মামা, তারপর?' রাশীক বলে।

'কিছুক্ষণ আগে ডাক্তার এসে বলেন, তার একটা ছুরি খুঁজে পাচ্ছেন না।'

'কিসের ছুরি?' ত্রিদিব একটু ঝুঁকে আসে মামার দিকে।

'অপারেশনের ছুরি।'

'অপারেশনের ছুরি? সেটা কোথায় রেখেছেন তিনি?'

'তোমাদের মামীর পেটের ভেতর।' মামা হাসতে নিয়ে মুখটা গম্ভীর করে ফেলেন আবার।'

'এটা কী বলছেন মামা!' রাশীক মামার একটা হাত ধরে ফেলে।

'ডাক্তার এসে তাই বললেন।'

'এখন কী হবে?'

'তোমার মামীকে আবার অপারেশন করাতে হবে।'

'এখনই করাতে হবে?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কী বলেছেন?'

'অতি কঠিন কিছু আমার বলা দরকার, কিন্তু বলতে পারিনি, বোধহয় পারবও না।'

বারান্দার কোনায় জানালাটার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন ডাক্তার। রাশীক, মিমি, ত্রিদিব আর মিতু মামীর রুম থেকে বের হয়ে তার কাছে গেল। ভীষণ বিরক্তি নিয়ে ডাক্তার ফিরে তাকালেন। রাশীক একটু হাসি হাসি মুখ করে বলল, 'কিছু কথা বলতে চাচ্ছি আপনাকে।'

ডাক্তারটি ভীষণ কর্কশ কণ্ঠে বললেন, 'বলুন।'

'একটা ডাক্তার কত অমনোযোগী হলে একটা জলজ্যান্ত ছুরি রোগীর পেটে রেখে যেতে পারে?'

ডাক্তার একবার তাকালেন, কিছু বললেন না।

'আচ্ছা, একটা মানুষের কত টাকা প্রয়োজন। রোগীর কাছ থেকে অধিক হারে ভিজিট নিচ্ছে, এটা-ওটা পরীক্ষা করার নামে ক্লিনিক থেকে পার্সেন্টেজ পাচ্ছে, এক হাসপাতালে চাকরি করে অন্য হাসপাতালে পার্টটাইম কাজ করছে—আর কত টাকা দরকার একটা মানুষের? আপনি বলতে পারেন, সত্যি সত্যি কত টাকা প্রয়োজন একটা মানুষের?'

ক্লিনিক থেকে বের হয়ে ত্রিদিব বলল, 'আমরা তো আজ ট্রেনে যাচ্ছি, না?'

'হ্যাঁ। রাজশাহীতে ট্রেনে করে গেলেই মজা।'

'আজ আমরা রাজশাহী যাচ্ছি?' মিমি লাফিয়ে উঠে বলল।

'রাজশাহী কি তোর খুব পছন্দের জায়গা?' রাশীক মিমির চোখের দিকে তাকিয়ে বলে।

'তুই জানিস না?'

রাশীক জানে। মিমির অনেক কথাই রাশীক জানে। মিমিকে জড়িয়ে অনেকগুলো স্মৃতি আছে তার। তার মধ্যে একটা স্মৃতি প্রায়ই মনে পড়ে। তবে সে স্মৃতিটা সুখের না দুঃখের—সেটা বুঝতে পারে না সে।

স্মৃতিটা মনে হলে কখনো হাসি পায়, কখনো অস্বস্তিতে ভোগে কিছুক্ষণ। তবে কখনো ভুলে যেতে চায় না সে এটা, বুকের ভেতর ধারণ করতে চায় আজীবন।

বাবার রাজনৈতিক বন্ধু হিসেবে মিমির বাবাসহ মিমিরা প্রায়ই তাদের বাসায় যায়, রাশীকরাও যায় মিমিদের বাসায়। সেই ছোটবেলা থেকে। মিমি যেহেতু তার বাবা-মার একমাত্র সন্তান, তাই সমবয়সী রাশীকের সঙ্গে বন্ধুত্বটা গড়ে ওঠে খুব দ্রুতই, একেবারে বাল্যবন্ধুত্ব। তার পর থেকে ওদের মধ্যে বন্ধুত্বটা ক্রমান্বয়ে বাড়তেই থাকে, স্রেফ বন্ধুত্ব। তবে দু পরিবার এ নিয়ে একটা হিসাবও কষে ফেলেছে। কিন্তু সে হিসাবে মত দেয়নি রাশীক, সে মিমিকে কেবল বন্ধু হিসেবেই দেখতে চায়, শুধু বন্ধু।

মিমির বাবা-মা দেশের বাইরে গেলে সে নিঃসঙ্গ মিমিকে সময় দিত প্রচুর, এখনো দেয়।

রাশীক একা একাই হেসে ফেলল আবার। স্মৃতিটা মনে পড়ছে তার—

মিমির বাবা-মা একবার দেশের বাইরে গেছেন। রাশীক মিমির সঙ্গে গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে। রাতে ছোট্ট একটা শব্দে ঘুম ভেঙে যায় রাশীকের, কিছুক্ষণ কিছুই বুঝতে পারে না। একটু সচেতন হতেই দেখতে পায় মিমির বাবা-মা দাঁড়িয়ে আছেন দরজার সামনে। ঘড়ির দিকে হঠাৎ চোখ যায়, রাত তিনটে। মিমি গুটিসুটি হয়ে ঘুমিয়ে আছে রাশীকের বুকের কাছে। ঝট করে উঠে বসতেই ঘুম ভেঙে যায় মিমির। এত রাতেও সামনে বাবা-মাকে দাঁড়ানো দেখে খুব সহজভাবে বলে, 'তোমরা আজকেই এলে যে?'

মা মিমির খাটের পাশে বসে বলেন, 'তোর বাবার কাজ শেষ হয়ে গেল, তাই চলে এলাম। এত দ্রুত রওনা হয়েছি, তোকে ফোন পর্যন্ত করতে পারিনি।'

'তোমরা কি ব্যাংকক থেকে এসেছ, না অন্য আরো কোথাও গিয়েছিলে?'

'না, ব্যাংককেই কাজ শেষ হয়ে গেল, ওখান থেকে এলাম।' মিমির মা এবার রাশীকের একটা হাত ধরে বলেন, 'তুমি লজ্জা পাচ্ছ কেন বাবা?'

'না, মানে—আন্টি, দুজনে গল্প করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি!'

'ভালো করেছ।' বলেই তিনি মিমির বাবাকে নিয়ে থেকে নিজেদের ঘরে চলে যান।

বেশ কিছুক্ষণ রাশীক সেভাবেই মাথাটা নিচু করে বসে থাকে। কেমন যেন লাগে তার, শূন্য শূন্য চারদিক। মিমি ব্যাপারটা বুঝতে পেরে রাশীকের পিঠে ছোট্ট করে একটা চিমটি কেটে বলে, 'এমন মূর্তির মতো বসে আছিস কেন!'

'এটা কী হলো?'

'কী হলো মানে?' কপালটা ভীষণভাবে কুঁচকে মিমি বলে, 'দুজন বন্ধু একসঙ্গে রিকশায় চড়তে পারব, একসঙ্গে বসে খেতে পারব, আর একসঙ্গে ঘুমাতে পারব না!' মিমি রাশীকের দিকে চেয়ে ঠোঁটের কোনায় একটু হাসি এনে বলে, 'আর আমরা তো ইচ্ছে করে ঘুমাইনি, একা একাই ঘুমিয়ে গেছি, একেবারে শুদ্ধ ঘুম।'

'আঙ্কেল-আন্টি কী ভাবলেন?'

'তুই তোর বাবা-মাকে চিনতে না পারিস, আমি আমার বাবা-মাকে ঠিকই চিনি।' মিমি বিছানা থেকে উঠতে উঠতে বলে, 'আর আমাদের মধ্যে এমন কিছু হয়নি বা করিনি যে আমরা অপরাধবোধে ভুগব। ওঠ, তুই পাশের ঘরে গিয়ে শো, আমি আমার ঘরেই ঘুমাব।'

কথাটা মনে পড়তেই রাশীক আবার হেসে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে মিমি বলল, 'হাসছিস কেন?'

'এমনি।'

'এমনি মানে?'

'এমনি মানে এমনি।' রাশীক হাসতে হাসতে বলে, 'তোর ওই ছেলেটা, কী যেন নাম ছিল ছেলেটার, ওর বাড়ি রাজশাহী না?'

মিমি কিছু বলে না। এই একটা প্রসঙ্গেই মিমি একদম চুপ হয়ে যায়। বোকা মেয়ে জানে না—জীবনে অনেক মানুষ আসেই চলে যাওয়ার জন্য, আর সে চলে যাওয়াটা মানুষকে কখনো মনে রাখতে হয় না!

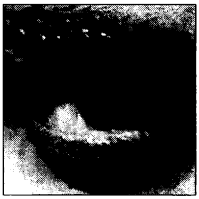

বাবার জন্য অপেক্ষা করেছে সে অনেকবার। কিন্তু এবারের মতো এত আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করেনি কখনো। ঘুম ভেঙেই তার প্রথম মনে হয় বাবার কথা। তারপর টানা পথের দিকে চেয়ে থাকা। সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়, দুপুর গড়িয়ে বিকেল, রাত, বাবা তবু আসে না। মাঝে মাঝে মনে হয়, এই বুঝি এলো, এই একটু পরই বাবা আসবে। সেই একটু আর শেষ হয় না। কিন্তু বাবাকে তার খুব দরকার।

তার বয়স যখন পাঁচ বছর, তখন একদিন তাদের বাড়িতে পুলিশ আসে। পুলিশ এসে বাবাকে খুঁজতে থাকে, কিন্তু পায় না। পরের দিনও পুলিশ আসে, পরের দিনও পায় না। ছয় দিন পর পুলিশ আসে একেবারে মাঝরাতে। তাদের বাড়ি ঘিরে ফেলে পুলিশ। তারপর তার বাবাকে ডাকতে থাকে। মাঝরাতের ঘুম ভেঙে বাবা কাঁপা কাঁপা পায়ে বিছানা থেকে নেমে দরজাটা খুলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে বাবার হাত-পায়ে দড়ি বেঁধে নিয়ে যায় পুলিশ।

সেবারও বাবার জন্য অপেক্ষা করেছে সে। কিন্তু বাবা বাড়িতে আসে প্রায় দেড় মাস পর। বাবার মুখটা দেখেই সে কেমন যেন চমকে যায়—বাবার মুখ এত শুকনো কেন, সে ভাবতে থাকে। তারপর দুপুরে গোসল করার সময় সে আবার চমকে ওঠে—বাবার শরীরে অনেকগুলো দাগ। সে দ্রুত দৌড়ে গিয়ে বাবার একটা হাত ধরে বলে, 'বাবা, এখানে এসব কী হয়েছে?'

বাবা নিজের শরীরের দিকে তাকায়। তারপর ম্লান হেসে বলে, 'কিছু না মা।'

'এগুলো তাহলে কিসের দাগ?'

'এমনি দাগ মা।'

'তোমাকে কি কেউ মেরেছে?'

'না মা।'

'তাহলে এসব দাগ কেন?'

বাবা আর কোনো জবাব দিতে পারে না। মেয়েকে জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে ওঠে। তারপর গোসল সেরে মেয়েকে নিয়ে খেতে বসে। কত দিন পর গরম ভাত খাচ্ছে বাবা। চোখে পানি এসে যায় আবার।

ক্লাস ওয়ানের কথা মনে পড়ে যায় তার। সে স্কুলে গেলে তাকে কেউ বসতে দিত না, তার সঙ্গে কেউ কথাও বলত না। কাঁদতে কাঁদতে সে যখন বাড়ি ফিরত, তখন বাবা আদর করে বলত, 'কী হয়েছে মা?'

'আমাকে কেউ বসতে দেয় না ক্লাসে। কথাও বলে না আমার সঙ্গে।'

বাবা জানে, বাবা জানে কেন অন্যান্য ছেলেমেয়ে তার মেয়েকে পাশে বসতে দেয় না, তার সঙ্গে কথা বলে না, তার সঙ্গে খেলে না। কিন্তু বাবা কিছু করতে পারে না। মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'আয় মা, আমি তোর সঙ্গে কথা বলি।'

'তুমি কী কথা বলবে বাবা?'

'আমি তোকে গল্প বলব।'

'কিসের গল্প বাবা?'

'রাক্ষসের গল্প, ভূতের গল্প, বাঘ-ভালুকের গল্প।'

গল্প শুনতে শুনতে মেয়ে ঘুমিয়ে যায়। ঘুমন্ত মেয়ের কপালে চুমু খেতে খেতে বাবা কেঁদে ফেলে।

কোনো কোনো বিকেলে মেয়েকে উদাস হয়ে বসে থাকতে দেখে বাবা বলে, 'কী হয়েছে মা?'

'আমাকে কেউ খেলতে নেয় না বাবা।'

'কে বলল নেয় না। এই যে আমি আছি, আমি তোর সঙ্গে খেলব।'

বাবা কথাটা বলেই মেয়েকে ঘরের ভেতর নিয়ে যায়। তারপর উপুড় হয়ে মেয়েকে বলেন, 'চর মা, আমার পিঠে চর।'

মেয়ে বাবার পিঠে চড়ে, বাবা ঘোড়ার মতো এগোতে থাকে। ঘোড়ায় চড়ার আনন্দে মেয়েটা চিৎকার করে ওঠে, মেয়ের সে আনন্দে নীরবে চোখের জল ফেলে বাবা।

একদিন এক সকালে গ্রামের অনেকগুলো লোক এসে বাবাকে ধরে নিয়ে যায়। বাবা যেতে চায় না, তবু জোর করে নিয়ে যায়। তারপর তাদের বাড়ির সামনে কাঁঠালগাছের সঙ্গে বাবাকে বেঁধে রাখে। একটু পর বাবার হাত-পা বেঁধে ঝুলিয়ে দেয় ওই কাঁঠালগাছের সঙ্গে। অনেকক্ষণ ঝুলিয়ে রাখার পর বাবাকে কী যে মার মেরেছিল তারা! বাবাকে মারতে দেখে সে চিৎকার করে মাকে বলে, 'মা, বাবাকে মারে কেন?'

মা কিছু বলে না। কাঁদে আর আঁচল দিয়ে চোখ মোছে।

মেয়েটা তখনো জানে না, তার বাবা আসলে কী করে।

ক্লাস থ্রিতে পড়ার সময় এক মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া লাগে তার। দোষটা অবশ্য তার না, ওই মেয়েটির। মেয়েটি তাকে পাশে বসতে দেবে না, কিন্তু সে বসবেই। শেষে মেয়েটি তাকে খামচে ধরে বলে, 'ওই চোরের বেটি, সর।'

অনেক ধরনের গালি সে শুনেছে, কিন্তু এই প্রথম এ গালিটা শুনে সে কেমন যেন কুঁকড়ে যায়। স্কুল থেকে বই-খাতা নিয়ে সে বাড়িতে ফিরে আসে। তারপর বিছানায় শুয়ে অবিরাম কাঁদতে থাকে। মা ঘরে ঢুকে মেয়েকে কাঁদতে দেখে বলে, 'কি হয়েছে মা?'

মেয়ে কিছু বলে না, শুধু কাঁদতে থাকে।

মা আবার বলে, 'কী হয়েছে, বল না।'

মেয়ে এবারও কিছু বলে না। অনেকক্ষণ কাঁদার পর সে চোখ-মুখ লাল করে বলে, 'মা, বাবা কি চোর?'

মায়ের বুকটা কেঁপে ওঠে। বেশ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে মা বলে, 'কে বলেছে তোকে এসব কথা?'

'তার আগে তুমি বলো, বাবা কি চোর?'

মা এবার কিছু বলে না। আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে মা চলে যায় রান্নাঘরে। রান্নাঘরের হেঁশেলের আগুন দেখতে দেখতে মা বুঝতে পারে, তার বুকের ভেতরও আগুন জ্বলে উঠেছে। আস্তে আস্তে তাকে পুড়িয়ে ফেলছে সে আগুন।

রাস্তা দিয়ে হেঁটে সে যখন স্কুলে যায়, ইদানীং অনেকেই তাকে আড়ালে-আবডালে চোরের বেটি বলে ডাকে। সে শোনে, কিন্তু কিছু বলে না। সে সারাক্ষণ স্রষ্টার কাছে মনে মনে বলে—আল্লাহ, তুমি আমাকে ধৈর্য দাও।

এত কষ্টের ঘটনার মাঝেও তার জীবনে মজার একটা ঘটনা এসেছিল। ক্লাস এইটে পড়ার সময় একটা ছেলে তাকে খুব ডিস্টার্ব করত। প্রতিদিন তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করত, ফুল দিতে চাইত, কোনো কোনো সময় হাতে চিঠি গুঁজে দিত।

ভীষণ বিরক্ত হতো সে। সে জানত এ বয়সে এসব মানায় না, এসব টিকেও থাকে না। যদিও কারো কারো টিকে থাকে, তার ক্ষেত্রে টিকবে না। কারণ—। বাকিটুকু সে আর ভাবতে পারে না, ভাবতে চায়ও না। নিয়তি তাকে এখানে এনে দাঁড় করিয়েছে, পালাবে কোথায় সে?

সম্ভবত সেদিন ছিল রোববার। স্কুল থেকে ফিরছিল সে। স্কুল থেকে তার বাসা প্রায় দুই কিলোমিটার। বেশ কিছুদূর আসার পর সে একা হয়ে যায়,

এতক্ষণ তার সঙ্গে কয়েকজন ছাত্রী ছিল, তারা যার যার বাড়িতে চলে গেছে। তাকে একা পেয়েই সেই ছেলেটা কোথা যেন উদয় হয় সামনে। মেয়েটা মুচকি হাসে, এতক্ষণ তাকে ফলো করছিল বোধহয় ছেলেটা।

মেয়েটা একটু দাঁড়িয়ে পড়ে ছেলেটাকে বলে, 'আপনি আমার কাছে কী চান?'

ছেলেটা খুব লাজুক মুখে বলে, 'তুমি জানো না?'

মেয়েটা বলে, 'না।'

'তুমি জানো না!' ছেলেটা অবাক চোখে বলে।

মেয়েটা আগের মতোই নির্ভার হয়ে বলে, 'না।'

ছেলেটা এবার একটু আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে বলে, 'আমি তোমাকে চাই।'

খুব শান্তভাবে মেয়েটা বলে, 'ভালো কথা। কিন্তু আমি কে, তা জানেন?'

'তুমি আবার কে, তুমি তো তুমিই।'

'না, আমার অন্যরকম একটা পরিচয় আছে।'

'কী?' ছেলেটা আগ্রহী হয়ে বলে।

'তখন ছেলেটাকে আমি একটা কথা বলেছিলাম।' রাশীক, মিমি, ত্রিদিব, মিতু খুব গভীর মনোযোগ দিয়ে মেয়েটার গল্প শুনছিল, তার জীবনের গল্প। ট্রেন থেকে নামার পর তাদের চারজনের মাথাই কেমন যেন ঝিমঝিম করছিল, সে ঝিমানিটা আর নেই।

মিমি মেয়েটার হাত ধরে বেশ উৎসাহী হয়ে বলল, 'কী বলেছিলে?'

'বলব?' মেয়েটা হাসতে থাকে।

'আহ্, বলোই না।' মিমি আরো উৎসাহী হয়ে ওঠে।

'আমি বলেছিলাম—আমার বাবা একজন চোর, আমি তার মেয়ে। তার মানে আমি হচ্ছি চোরের বেটি। আপনি কি এর পরও আমার কাছে আসবেন?'

'ছেলেটা আর কখনো আসেনি?'

'না।'

'তাতে কি, কেউ এসে চলে গেলে কারো কিছু আসে-যায় না।'

রাশীক ঝট করে মিমির দিকে তাকায়। তারপর চোখ দুটো একটু বুজে মিমির কথায় সম্মতি জানিয়ে বলে, 'হ্যাঁ, জীবনে অনেকেই আসবে, অনেকেই চলে যাবে, তাতে কারো কিছু যায়-আসে না।' রাশীক একটু থেমে বলে, 'তোমার বাবা তো এখন জেলে আছেন, না?'

'হ্যাঁ।'

'তিনি কবে ছাড়া পাবেন, জানো?'

'না।' মেয়েটা মাথা নিচু করে বলে, 'কিন্তু বাবাকে আমার খুব দরকার।'

'কেন?'

'আমি এবার ক্লাস নাইনে উঠেছি। প্রচণ্ড কষ্ট, প্রচণ্ড প্রতিকূলতার মাঝে আমি পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু এখন বোধহয় আর পারব না।'

ত্রিদিব কিছুটা শব্দ করে বলে, 'কেন?'

'ক্লাস নাইনে আমার বই লাগবে, কিন্তু বই কেনার সাধ্য আমার নেই, আমার মায়েরও নেই।'

'আশপাশের কাউকে বলেছ?'

'বলেছি।'

'তারা কী বলেছেন?'

'তারা কেউ সাহায্য করতে চায় না আমাকে।'

ত্রিদিবের মতো রাশীকও এবার শব্দ করে বলে, 'কেন?'

'কেন?' মেয়েটা হাসতে থাকে, কিন্তু তার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। বেশ কিছুক্ষণ পর সে চোখ দুটো মুছতে মুছতে বলে, 'আমি চোরের বেটি যে!'

মিতু একটু ফাঁকে বসে ছিল। সে আস্তে আস্তে উঠে আসে, তারপর মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠে বলে, 'আপু রে, আমরা সবাই চোরের বেটি। আমাদের কারো বাবা মন্ত্রী, সে মন্ত্রীও চুরি করছে; আমাদের কারো বাবা সরকারি কর্মকর্তা, সে সরকারি কর্মকর্তাও চুরি করে; আমাদের কারো বাবা ডাক্তার, পুলিশ, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, ব্যবসায়ী—সবাই চুরি করে।'

'কিন্তু তাদের মেয়েরা তো ভালো আছে, আমার এত কষ্ট কেন? তাদের তো কেউ চোরের বেটি বলে না, আমাকে বলে কেন?'

রাজশাহীর বাঘা অঞ্চলটা কেমন যে অন্ধকার হয়ে আসছে, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। রাশীক সন্ধ্যার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে, অনেকগুলো পাখি একসঙ্গে কোথায় যেন উড়ে যাচ্ছে। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে ভাবে—হায়, যদি মানুষ না হয়ে পাখি হয়ে জন্মাতাম!

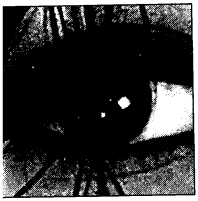

ট্রেন থেকে নেমেই রাশীক বলল, 'তোরা কি এখন যার যার বাসায় যাবি, না অন্য কোথাও যাবি?'

'কেন?' মিমি রাশীকের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

'না গেলে আমার বাসায় যেতে বলতাম, আড্ডা দিতাম একটু।'

'একটা ব্যাপার খেয়াল করেছিস।' মিতু একটু শব্দ করে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করে বলে, 'রাজশাহী যেতে আমাদের যত সময় লেগেছে, ঢাকা ফিরতে মনে হয় তার চেয়ে অনেক কম সময় লেগেছে।'

'তাই?' ত্রিদিব হাসতে হাসতে বলে, 'পৃথিবীর সব চেনা পথ চলতে কম সময় লাগে, কেবল অচেনা পথেই সময় লাগে বেশি। আমাদের পরিকল্পনায় আমরা এখন যে পথটাতে চলছি, সেটা কিন্তু একটা অচেনা পথ।'

'জানি।' মিতু কিছুটা দৃঢ়তার সঙ্গে বলে, 'তবু আমরা পথ চলব।'

রাশীক সঙ্গে সঙ্গে বলে, 'চলতে আমাদের হবেই।'

'আচ্ছা, সিটি করপোরেশন কী করে, বল তো।' মিমি রাস্তার পাশে একটা ডাস্টবিনের দিকে তাকিয়ে বলে, 'দেখেছিস, ময়লাগুলো কেমন উপচে পড়ছে!'

'এটা তো প্রতিদিনই দেখি।' ত্রিদিব নাকটা ঢাকতে ঢাকতে বলল।

'কেউ কিছু বলে না।'

'কী বলবে। প্রতিদিনই তো এসব নিয়ে পত্রিকায় লেখালেখি হচ্ছে।'

'আচ্ছা, এমন করলে কেমন হয়?' মিমি কথাটা বলতে নিয়েই থেমে গেল।

'থামলি কেন, বল।' ত্রিদিব মিমির মাথায় একটা চাটি দিয়ে বলল।

'সিটি করপোরেশনের মেয়রকে যদি প্রতি সপ্তাহে একবার করে এ রকম ডাস্টবিনের সঙ্গে বেঁধে রাখা যায়, তাহলে কেমন হয়?'

'কিছুই হবে না।' রাশীক ঠোঁট দুটো উল্টে বলল।

'কেন?'

'কোনো মানুষ যখন ক্ষমতাবান হয়, তখন আর সে মানুষ থাকে না।

ডাস্টবিনের সঙ্গে বাঁধতে হলে এক 'মানুষ'কে বাঁধতে হবে।'

মিমি মাথাটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলে, 'তাহলে তো কোনো দিনই কোনো মেয়রকে ডাস্টবিনের সঙ্গে বাঁধা যাবে না।'

'হ্যাঁ, যাবে না।' রাশীক স্টেশনের বাইরে পা রেখে বলে, 'তাহলে তোরা আমার বাসায় যাচ্ছিস?'

ভীষণ ক্লান্ত লাগছে ওদের। কিছুক্ষণ গিয়ে মিতু সেটা বলেও ফেলল, 'প্রচণ্ড ক্লান্ত লাগছে রে।'

'শরীরে, না মনে?' ত্রিদিব হাসতে হাসতে বলে।

'দুটোতেই।'

'মনেও ক্লান্তি!' বেশ অবাক হয়ে বলে ত্রিদিব।

'হয়তো আমাদের অনুভূতিতেও ক্লান্তি এসে ভর করছে। এই যে দেখ, প্রতিদিন দেশে এত মানুষ মরছে, কারো কোনো মাথাব্যথা নেই, সবাই কেমন চুপচাপ।'

'শুধু মানুষ মরছে?' রাশীক কান্না কান্না কণ্ঠে বলে, 'প্রতিদিন আমরা আস্তে আস্তে পিছিয়ে পরছি, জীবন থেকে, জীবনের সুন্দরতম মুহূর্ত থেকে।'

'চারদিকে অবিশ্বাসের ছড়াছড়ি।' ত্রিদিব হতাশার সুরে বলে মিমির দিকে তাকায়, 'সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে হতাশাগ্রস্ত তরুণ আমরা। আমাদের মনে রঙ নেই, আমাদের চিন্তায় কোনো রঙ নেই, আমাদের বিশ্বাসও আজ বর্ণহীন। চারদিকে কেবল ধূসর আর ধূসর।'

'আচ্ছা বল তো, এই যে এত সব ব্যর্থতা, এর দায়ভার কার?' মিতু রাশীকের দিকে তাকিয়ে আবার ত্রিদিবের দিকে তাকায়।

'আমাদের সবার।' রাশীক হঠাৎ কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে যায়, 'প্রতি পাঁচ বছর পর কিছু বর্বর আমাদের সামনে উপস্থিত হয়, হেসে হেসে আমাদের সঙ্গে কথা বলে, নিজেকে মানুষ বলে পরিচয় দেয়। কিছুদিন পরই তারা দানব হয়ে যায়। পাঁচ পাঁচটি বছর আমরা সেসব দানবের বর্বরতা সহ্য করি।

আবার পাঁচ বছর চলে যায়, তারা আবার আসে, হাসে, কথা বলে। আমরা নির্লজ্জের মতো আবার ভুলে যাই, ভোট দিই তাদের, নিজেদেরকে অত্যাচার করার লাইসেন্স দিই তাদের। কী হয় তাদের ভোট না দিলে। যদি একবার, যদি একবার তাদের ভোট না দিই আমরা, যদি একবার তাদের প্রত্যাখ্যান করতে পারি!' দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে রাশীক ত্রিদিবের দিকে তাকায়। লাল হয়ে গেছে ত্রিদিবের চোখ। ওর চোখ টলটল করছে।

চোখ টলটল করছে ত্রিদিবেরও। চোখ মুছতে মুছতে ত্রিদিব বলে, 'আজ

আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না রে।'

'আমারও না।' মিমি বলে।

'তোরা কি তাহলে তোদের বাসায় চলে যাবি? রাশীক ত্রিদিব আর মিমির দিকে তাকায়।

'আজ যাই। কাল তো আমরা গাইবান্ধায় যাচ্ছি, না?' মিমি রাশীকের দিকে তাকিয়ে বলে।

'হ্যাঁ। গাইবান্ধার কুমারগাড়ী গ্রামে।'

'রাতে তোকে ফোন দেব।' ত্রিদিব রাশীককে বলে মিতুর দিকে তাকায়, 'তুই কি আমার সঙ্গে যাবি, বাসায় নামিয়ে দিতাম তোকে।'

'হ্যাঁ, চল।'

ওরা চলে গেল, রাশীক তবু দাঁড়িয়ে রইল। বাসায় ফিরতে ইচ্ছে করছে না ওর। চারদিকে এত মানুষ, তবু কেমন যেন খাঁ খাঁ করছে চারদিক। মাথার ওপর নিশ্চুপ আকাশ। কিন্তু সে আকাশও এখন দেখা যাচ্ছে না। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় অনেক ইট-পাথরের ঘর আর বড় বড় বাণিজ্যের সাইনবোর্ড।

বেশ রাত করে বাসায় ফিরল রাশীক। তার ঘরের একটা চেয়ারে বসে আছেন গ্রাম থেকে আসা সেই দাদা। হাতে কোরআন শরিফ নিয়ে তিনি সেটা পড়ছেন। রাশীককে দেখেই তিনি বললেন, 'মানুষ পেলে?'

রাশীক হাসতে হাসতে বলে, 'পাব দাদা, একদিন অবশ্যই পেয়ে যাব।'

'আমারও সে বিশ্বাস, তোমরা পেয়ে যাবে।'

'দাদা।' জুতাটা খুলতে খুলতে রাশীক বলে, 'পেনশনের কতদূর হলো?'

'এখনো তেমন কিছু বুঝতে পারছি না।'

'কী বলে তারা?'

'আজ না কাল, কাল না পরশু।'

'বাবাকে জানিয়েছেন?'

'না।'

'বাবাকে জানালে অবশ্য দু-এক দিনের মধ্যে কাজটা হয়ে যাবে আপনার।'

'কিন্তু আমি বলব না।'

রাশীক ঝট করে দাদার মুখের দিকে তাকাল। কোরআন শরিফটা বন্ধ করে দাদা সামনের দিকে তাকিয়ে আছেন। সাদা দেয়াল সামনে, তবু তিনি কী যেন

দেখছেন দেয়ালে। কী আছে সে সাদা দেয়ালে—নিজের ভাগ্যলিখন, না কোনো অশুভ বার্তা।

'দাদা, একটা কথা বলব আপনাকে?'

কিছুটা চমকে উঠে দাদা বলেন, 'বলো।'

'আপনার কোনো ছাত্র কি ওপরের কোনো লেভেলে চাকরি করছে এখন?'

'হ্যাঁ করছে।'

'আপনি কি জানেন—সে সৎ মানুষ, না অসৎ মানুষ?

'তা তো জানি না!'

'যদি অসৎ হয়, তাহলে এর জন্য দায়ী কে?'

দাদা কিছু বলেন না, কেবল গভীর চোখে রাশীকের দিকে তাকান। রাশীক মিটিমিটি হাসতে হাসতে বলে, 'দেশটা কেমন হয়ে যাচ্ছে, না?'

অনেকক্ষণ পর দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়েন দাদা। কিছু বলেন না। তিনি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াতেই রাশীক আবার বলে, 'দাদা, কিছু বললেন না যে?'

'তোমার বয়স কত?'

'চব্বিশ।'

'তুমি চব্বিশ বছরের চোখ দিয়ে এখন যা দেখছ, তার ডবলেরও বেশি চোখ দিয়ে অনেক আগেই তা দেখেছি আমি।'

'আপনার কষ্ট লাগে না?'

'না।'

'কেন?'

'মানুষকে অন্যায় করতে দেখলে কষ্ট লাগে, চারপাশে এখন তো আমি কোনো মানুষ দেখি না রাশীক!'

ঘর থেকে বের হয়ে যান দাদা। একটু পর দাদু ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলেন, 'রাশীক আছিস?'

রাশীক এগিয়ে গিয়ে দাদুর হাত ধরে বলে, 'এখনো ঘুমাওনি দাদু?'

'ঘুম আসছে না রে।'

'কেন?'

'কী জানি। শোন—।' দাদু রাশীকের গা হাতাতে হাতাতে বলেন, 'নিপা কেন জানি কাঁদছে।'

'কেন, কী হয়েছে আপুর?'

'কিছুই তো বলে না।'

'বাবা-মা কই?'

'ওরা তো সন্ধ্যার দিকে বাসা থেকে বের হলো, এখনো আসেনি।'

রাশীক নিপা আপুর দরজায় টোকা দিয়ে বলল, 'আপু, আসব?'

লাইট বন্ধ ছিল নিপার ঘরের। লাইটটা জ্বালিয়ে নিপা বলল, 'আয়।'

রাশীক ঘরে ঢুকে আপুর পাশে বসে অনেকক্ষণ কিছু বলল না। একসময় দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে রাশীক বলল, 'আগে তুমি মাঝরাতে কাঁদতে, ইদানীং তুমি প্রায় সব সময়ই কাঁদো, কারণ কী, বলো তো আপু?'

'জানি না।'

'আমি কিন্তু জানি।' রাশীক নিপার একটা হাত জড়িয়ে ধরে বলে, 'কী হয় আপু, এক জীবনে মানুষের আর কত আনন্দের প্রয়োজন। তুমি কি জানো আপু, প্রতিটি অসৎ আনন্দের পেছনে একটা কান্না লুকিয়ে থাকে?'

নিপা কিছু বলে না। সে আবার কাঁদতে থাকে। তার চোখ থেকে অবিরাম পানি পড়ছে। যেন সেগুলো পানি না, নিঃসীম কষ্ট। কষ্টগুলো ঝরে ঝরে পড়ছে— টপ টপ, টপ টপ!'

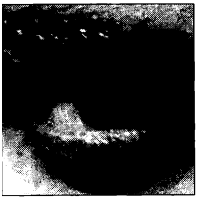

বাবা তাকে প্রতিদিন ডাকেন, 'আয় বাবা, ঘর থেকে বের হয়ে আয় একবার। দেখ, বাইরে কত সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটেছে, নানা রঙের পাখি গান গাইছে, তুই যে একটা জামরুলগাছ লাগিয়েছিলি, সে গাছে জামরুলও ধরেছে।' কিন্তু বাবার সে ডাকে সাড়া দেয় না আশরাফ আলী। চুপচাপ বসে থাকে সে, নিজেকে বন্দি করে রাখে দশ হাত বাই সাত হাতের অন্ধকার একটা ঘরে। ঘরের বাইরে অনেক কিছু ঘটে যায় প্রতিদিন, আনন্দ-বেদনার ঘটনা। কিন্তু কোনো কিছুই স্পর্শ করে না তাকে। সে আগের মতোই বসে থাকে চুপচাপ, সারাক্ষণ।

অথচ আশরাফ আলী এমন ছিল না কখনো। যে বছর সে ম্যাট্রিক পাস করল, সে বছর একটা বাঁশি কিনেছিল সে, বাঁশের বাঁশি। সময় পেলেই বাঁশিটা বাজাত সে। একসময় তার নামও হয়ে গিয়েছিল বাঁশিওয়ালা আশরাফ।

বাঁশি বাজাতে বাজাতেই একদিন এক মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয় তার। মেয়েটা হাসতে হাসতে তাকে বলে, 'বাঁশির সুরে নাকি আকাশের চাঁদও নেমে আসে?'

আশরাফ আলী ছোট্ট করে বলেছিল, 'আসে।'

'আপনার বাঁশির সুরে কোনো দিন নেমে এসেছিল?'

'না, এত দিন আসেনি।' পূর্ণ চোখে আশরাফ মেয়েটার দিকে তাকায়, তারপর সেও মিটিমিটি হেসে বলে, 'কিন্তু আজ এসেছে।'

'আজ এসেছে!' মেয়েটি আশপাশে তাকিয়ে কিছুটা উদগ্রীব হয়ে বলে, 'কই!'

আশরাফ আগের মতোই ছোট্ট করে বলে, 'আছে।'

'কই, আমি তো দেখতে পাচ্ছি না!'

'পৃথিবীতে নেমে আসা চাঁদকে সবাই দেখতে পায় না।'

মেয়েটা কিছুটা অবাক হয়ে বলে, 'তাই!'

'হ্যাঁ। তবে কেউ কেউ দেখতে পায়।'

মেয়েটা এবার অভিমান করে বলে, 'তার মানে আপনি চাঁদকে দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু আমি পাচ্ছি না?'

'হ্যাঁ।' আশরাফ আবার হাসতে হাসতে বলে, 'আরেকটা কথা— চাঁদও কিন্তু কখনো নিজেকে দেখতে পায় না।'

'তা না পাক, কিন্তু আমি দেখব। আমি দেখব, দেখি কোথায় আপনার চাঁদ নেমে আসে।'

তার পর থেকে প্রতিদিন আশরাফের কাছে আসে মেয়েটা। আশরাফের বাঁশি শুনতে শুনতে সে চাঁদ দেখার কথা ভুলে যায়, সে অপলক চোখে আশরাফকে দেখতে থাকে। আশরাফ তখন লাজুক মুখে বলে, 'কী দেখছ তুমি?'

মেয়েটা দুষ্টু দুষ্টু হাসি হেসে বলে, 'কিছু তো একটা দেখছিই।'

'আমিও দেখছি।'

অস্ফুট স্বরে মেয়েটা বলে, 'কী দেখছ?'

আশরাফ আলীও এবার দুষ্টু দুষ্টু হাসি দিয়ে বলে, 'চাঁদ দেখছি।'

মেয়েটা চোখ দুটো নিচু করে বেশ কিছুক্ষণ চুপ থাকে। তারপর বলে, 'আমি সে চাঁদের আলো দেখছি।'

আশরাফ আলীর বাঁশির সুরটা আরো ছন্দময় হয়ে ওঠে, আরো মধুর শোনায় সে শব্দ, গাছের পাতারা মুগ্ধ হয়ে যায় চুপি চুপি।

পরের দিন থেকেই কেমন যেন অস্থির হয়ে যায় আশরাফ আলী। সে একমনে বাঁশি বাজাতে থাকে, আকাশের চাঁদও নেমে আসে মাটিতে, কিন্তু মাটির চাঁদ আজ আসে না।

পরপর তিন দিন এ রকম হয়। মেয়েটা আসে না। আশরাফ আলীর বাঁশিও আর বাজে না। বাঁশি বাজানো বাদ দিয়ে সে এখন চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকে, আশপাশের গাছের দিকে তাকিয়ে থাকে, পায়ের নিচের মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে। নীল নীল ঘাসফুলগুলো কেমন যেন আরো নীল হয়ে যায় তার বেদনায়, চাঁদের আলো ঘোলাটে ম্লান মনে হয়, গাছের পাতারাও স্থির হয়ে যায় একেবারে।

মা সুরুজজান বেগম আশরাফকে একদিন বলেন, 'বাবা, তুই কদিন ধরে মুখটা গোমড়া করে রেখেছিস, তোর কি কিছু হয়েছে?'

আশরাফ আলী কিছু বলে না।

'তোর কি মন খারাপ বাবা?'

আশরাফ আলী এবারও কিছু বলে না।

মা সুরুজজান এবার আশরাফ আলীর একটা হাত চেপে ধরেন, 'বাবা, তোর দুঃখে যে আমারও ঘুম আসে না। বল না, তোর কী হয়েছে?'

ছলছল চোখে আশরাফ আলী এবার বলে, 'আমার কিছু ভালো লাগে না মা।'

'কেন, কী হয়েছে?' অস্থির হয়ে যান সুরুজজান বেগম।

'আমি জানি না।'

'কেউ কি তোকে খারাপ কথা বলেছে?'

'না।'

'তাহলে কেউ কি ভয় দেখিয়েছে?'

'না।'

'তাহলে?'

'আমি জানি না।' বলেই আশরাফ আলী বাঁশি বাজাতে শুরু করে। কিন্তু সে বাঁশি আর বাজে না। বাঁশিতে ফুঁ দেয় সে, কেবল ফুঁর শব্দই শোনা যায়, বাঁশিতে আর শব্দ হয় না।

মা কাঁদতে কাঁদতে চলে যান রান্নাঘরে। আশরাফ আলীও কাঁদতে থাকে নিজের ঘরে।

৯ দিন পর মেয়েটি হঠাৎ আশরাফ আলীর ঘরে এসে বলে, 'এ কদিন একবারও খোঁজ নিলে না?'

দু চোখ যথাসম্ভব বড় করে আশরাফ আলী মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকে, কোনো কথা বলতে পারে না, কোনো কথা বের হয় না তার মুখ দিয়ে। কেবল তার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে থাকে।

মেয়েটা আশরাফের চোখ মুছে দিতে দিতে বলে, 'খুব কষ্ট পেয়েছ, না?'

চোখে জল নিয়ে আশরাফ আলী বলে, 'হ্যাঁ, মরে যাওয়ার মতো কষ্ট।'

আশরাফের মুখটা চেপে ধরে মেয়েটা বলে, 'ছি, এভাবে কেউ বলে!'

'এত দিন কোথায় ছিলে?'

'আমি যেখানে থাকি।'

'কোথায়?'

'আমাদের বাড়িতে।'

'বাঁশি শুনতে আসোনি যে?'

'তুমি আমাকে ডেকে আনোনি যে।'

'কেন এমন করলে, বলো তো?'

পূর্ণ চোখে মেয়েটি আশরাফ আলীর দিকে তাকায়। তারপর হাসতে হাসতে

বলে, 'তোমাকে পরীক্ষা করলাম।'

'পরীক্ষা!' আশরাফ আলী চমকে ওঠে।

'হ্যাঁ, পরীক্ষা।'

'কিসের পরীক্ষা?'

মেয়েটা আবার হাসে। এবার অনেকক্ষণ হাসার পর সে বলে, 'তা তো জানি না।'

আশরাফ আলী একদম চুপ হয়ে যায়। মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে একসময় অনেক কিছু ভেবে ফেলে। শেষে বলে, 'তা আমি পরীক্ষায় পাস করেছি, না ফেল?'

'এটা তো জানি না!' মেয়েটা হাসতে হাসতে আশরাফ আলীর দিকে তাকায়।

'জানো না?' ভেজা গলায় বলল আশরাফ আলী।

'না, জানি না।'

আশরাফ আলী আবার বাঁশি বাজাতে থাকে প্রতিদিন। মেয়েটা প্রতিদিন আবার আসতে থাকে। মাঝে মাঝে সমস্ত প্রকৃতি তাকিয়ে দেখে তাদের—সুখী দুটি মানুষ, সুখী দুটি আত্মা।

মেয়েটা হঠাৎ একদিন বলে, 'তোমাকে একটা কথা বলি?'

'বলো।'

'আমার না বিয়ে।' মেয়েটা কথাটা বলে হাসতে থাকে।

আশরাফ আলী গভীর চোখে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বলে, 'আবার পরীক্ষা করছ?'

'যদি বলি হ্যাঁ।'

'ভালো, পৃথিবীর সবকিছু পরীক্ষা করে নেওয়া ভালো। '

'না, বিশ্বাস যেখানে প্রবল, বাকি সবকিছু সেখানে অপ্রয়োজনীয়।'

'এত বিশ্বাস আমার ওপর?'

মেয়েটার সঙ্গে আশরাফ আলীর সেই শেষ দেখা। তার পর থেকে ষোল বছর ধরে সে অপেক্ষা করছে মেয়েটার জন্য। মেয়েটা এখনো আসেনি।

মিতুর এতক্ষণ স্বপ্নের মতো লাগছিল সবকিছু। আশরাফ আলীর কথাগুলো শেষ হতেই সে বলল, 'এই ষোল বছরে আপনি কী পেলেন?'

'অনেক কিছু।'

'অপেক্ষা তো যন্ত্রণাময়, আপনার খারাপ লাগেনি?'

'না। অপেক্ষার একটা আলাদা মজা আছে।'

'তাই বলে একটা ছোট্ট ঘরের মধ্যে নিজেকে বন্দি করে!' ত্রিদিব বেশ অবাক হয়ে বলে।

'কী করব বলুন? এ মুখ আমি কাকে দেখাই। ঘর থেকে বের হতে চাইলেই আমার মনে হতো—চাঁদ আমাকে পরিহাস করবে, গাছগুলো আমাকে দেখে হাসবে, ঘাসফুলগুলো আমাকে নিয়ে মজা করে কথা বলবে। '

'অপেক্ষা করতে আপনার সত্যি কোনো খারাপ লাগেনি?' মিমি খুব ছলছল চোখে বলল।

'একটুও না। অপেক্ষা যে কত আনন্দময়, যদি সেটা সত্যিকারের অপেক্ষা হয়! একা একা চুপচাপ ঘরে বসে থাকতে থাকতে আমার মনে হতো—এটাও একটা পরীক্ষা। এই পরীক্ষা শেষে মেয়েটা হঠাৎ একদিন আমার দরজায় টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকে বলবে, আমি আর কক্ষনো ফিরে যাব না। তুমি কি আমাকে শক্ত করে একটু ধরবে?'

'মেয়েটা এখন কোথায় আছে?' রাশীক অনেকক্ষণ পর একটু সোজা হয়ে বসে বলল।

'ওর সংসারে, বিয়ে করে ও খুব সুখে আছে।'

'ও সুখে আছে, এটা জানলেন কী করে?'

'আমি যে প্রতিদিন ওর সুখের জন্য কাঁদি, প্রার্থনা করি।'

'মেয়েটা তারপর এক দিনও আসেনি আপনার কাছে?'

'ও তো আমাকে ছেড়ে যায়নি। আমি তো পাশ ফিরে তাকলেই ওকে দেখতে পাই, সামনে তাকালেই ওকে দেখতে পাই, পেছনে তাকালেও দেখতে পাই। ও একদিন অবশ্যই একটা কথা বলবে। আমি সে কথাটা শোনার জন্য আজও অপেক্ষা করছি।'

রাশীক প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে বলে, 'কী কথা?'

'পরীক্ষায় তুমি পাস করেছ আশরাফ, স্টার মার্কস নিয়ে পাস করেছ।'

'তারপর?'

'তারপর আর কিছু না, আর কিছু না, আর কিছু না...।'

হো হো করে আশরাফ আলী এই প্রথম কেঁদে ওঠে। তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে। অনেকক্ষণ কাঁদার পর সে স্পষ্ট স্বরে মিমি, মিতু, ত্রিদিব আর রাশীকের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আচ্ছা, আপনারন কি জানেন, ও কি আর কখনো আসবে আমার কাছে?'

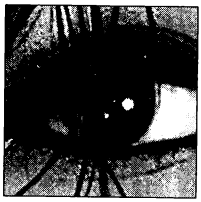

বাবা ঘরে ঢুকলেন, সঙ্গে মা-ও। রাশীক একটু ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখে আবার আগের মতো দাঁড়াল। ওদের বাসায় ওপাশের বারান্দায় কয়েকটা ফুলের টব আছে। একটা টবে ফুল ফুটেছে, গাঁদা ফুল। কয়েকটা ছোট ছোট প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে সে ফুলগুলোতে।

ঘরের মাঝখানে এসে বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। রাশীক না তাকিয়েও টের পেল সেটা। একটু পর মা এগিয়ে এসে খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে বলল, 'তোর বাবা তোর সঙ্গে কিছু কথা বলতে চায়।'

রাশীক ফিরে না তাকিয়ে বলল, 'আমার এখন কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।'

'কেন?' মা রাশীকের গায়ে একটা হাত রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু একটু সরে দাঁড়ায় রাশীক।

বাবা এগিয়ে এসে বলেন, 'তুমি নাকি কী সব মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছ?'

রাশীক অনেক কষ্টে যেন বলল, 'হ্যাঁ।'

'কিসের মানুষ খুঁজছ তুমি?'

'কোনো কিছুর না, আমি শুধু মানুষ খুঁজছি।'

'তোমার আশপাশে কোনো মানুষ নেই?'

'না।'

'কে বলল নেই? আমি মানুষ না? তোমার মা মানুষ না?'

ঘুরে দাঁড়াল রাশীক। বাবার দিকে পূর্ণ চোখে তাকাল। বেশ কিছুক্ষণ সেভাবে তাকিয়ে থেকে বলল, 'একজন রাজনীতিবিদকে মানুষ ভাবতে আমার আপত্তি আছে, অন্তত বাংলাদেশের একজন রাজনীতিবিদকে।'

'তুমি তাদের কী মনে কর?'

'কোনো প্রাণী ভাবতে পারলে ভালো লাগত, কিন্তু তাতে সেই প্রাণীর অপমান হবে। আর— ।'

'আর?'

'প্রচণ্ড ধূর্ত অভিনেতা মনে হয় তাদের। এত চমৎকার দেশপ্রেমিক, জনসেবক, সমাজসেবকের অভিনয় করে তারা! অথচ জানো, তাদের গায়ের সমস্ত চামড়া তুলে ফেলে পাঁচ শ বছর আগুনে পোড়ালেও সে চামড়া থেকে এক টুকরো শুদ্ধ দেশপ্রেম বের হবে না, তাদের গায়ের সমস্ত রস বের করে কোনো ভালো ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করলেও সেখানে মনুষ্যত্বের অস্তিত্ব পাওয়া যাবে না। তাদের সমস্ত অবয়বে কেবল লোভ, স্বার্থপরতা আর দুর্নীতি।'

'আজকাল এসব কথা বলার জন্য কোথাও ট্রেনিং নিচ্ছ নাকি?'

'প্রতিদিন এত রাজনীতিবিদকে দেখি, তাদের কথা শুনি, তাদের অপকর্ম দেখি—এর পরও এসব বলার জন্য কোথাও ট্রেনিং নিতে হবে?'

'নিজেকে কী ভাব তুমি?'

'সেটাই যদি জানতাম তাহলে অন্তত এখানে থাকতাম না। ধরা যাক, নিজেকে একজন—।'

বাবা হাত উঁচু করে রাশীককে থামিয়ে দিলেন, 'আমি জানি তুমি কী বলবে। আমাকে নাহয় মানুষ ভাব না, কিন্তু তোমার মা?'

'আমার মা? আমার মা-ও কি একটা মানুষ? মায়েরা তো হয় নরম তুলোর মতো, যাকে সারাক্ষণ জড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করে; মায়েরা হয় শিশিরভেজা ঘাসের মতো, যাকে যখন-তখন ছুঁতে ইচ্ছে করে; মায়েরা তো হয় গাছের ছায়ার মতো, যার স্পর্শে এলে শীতল হয়ে যায় মন, শরীর, হৃদয়, আত্মা।'

'তোমার মা—।'

এবার বাবাকে থামিয়ে দেয় রাশীক, 'আমার মা হচ্ছে একজন ক্যারিয়ারিস্ট। সন্তানের যত্নের চেয়ে যে তার ক্যারিয়ারের যত্ন বেশি করে; যে তার সংসারের চেয়ে বাইরে সময় কাটাতে অধিক পছন্দ করে। কিংবা মাকে বলতে পার একটা সিঁড়ি। যাকে ইচ্ছেমতো ব্যবহার করে তুমি আজ এখানে এসে পৌঁছেছ, এত ওপরে উঠেছ।'

'কী সব আবোল-তাবোল বলছ তুমি?'

'আবোল-তাবোল বলছি! তুমি আজ যে জায়গায় দাঁড়িয়েছ, আগামীতে নির্দ্বিধায় একজন সংসদ সদস্য হবে, একটু চেষ্টা করলে ভালো একটা মন্ত্রিত্বও পেয়ে যেতে পার। তোমার আর কী চাই বাবা?'

'এসব কাদের জন্য করছি!'

রাশীক একটু ক্রূর হাসি হেসে পাল্টা প্রশ্ন করে, 'কাদের জন্য করছ?'

'জানো না, কাদের জন্য করছি?'

'কারো জন্যই না বাবা, তুমি করছ কেবল তোমার জন্য। তুমি যদি তোমার সন্তানদের জন্যই করতে, তাহলে তোমার এক ছেলে নেশা করত করতে জীবন্ত ফসিলে পরিণত হতো না, তোমার মেয়ে তার জীবন নিয়ে এত পুতুলখেলা খেলত না, প্রায়ই তাকে ক্লিনিকে গিয়ে মুক্ত হয়ে আসতে হতো না।'

'তুমি কি কোনো কারণে শক্‌ড্?' বাবা কেমন যেন আগ্রহ নিয়ে কথাটা বলেন।

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে রাশীক বাবার দিকে তাকায়। বহুদিন আগে বাবা তাকে একদিন এই প্রশ্নটা করেছিলেন। প্রশ্নটা শুনে বুকের ভেতরটা ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল তার।

'কথা বলছ না কেন?'

'আমার আপাতত কোনো কথা নেই বাবা। আমি আমার কথাগুলোকে একটা সাদা পাতায় লিখেছিলাম। বলতে পার তোমাকে একটা চিঠি লিখেছিলাম আমি।'

'কিসের চিঠি?'

'কিসের চিঠি?' চিঠিটির কথা মনে করতে থাকে রাশীক। কয়েক বছর আগে সে তার বাবাকে একটা চিঠি লিখেছিল—

বাবা

পৃথিবীটা এ রকম—একজনকে ধরে আরেকজন ওপরে ওঠে। আর তুমি ওপরে উঠলে মাকে ধরে। সাফল্যের সিঁড়ি হিসেবে মাকে ব্যবহার করে তুমি অনেক কিছু পেয়েছ বাবা। তোমার সম্পদ হয়েছে, অর্থ হয়েছে, দেশের একজন কর্তা হিসেবে তোমার একটা পরিচয়ও হয়েছে।

বাবা, সবাই আইডেনটিটি চায়। আমিও চাই। সেই ব্যক্তিগত পরিচয় পাওয়ার আগেই আমি আমার আসল পরিচয়টা পেয়ে গেলাম বাবা।

তোমার মনে আছে, তোমাদের লাস্ট বিবাহবার্ষিকীতে একটা বিশাল পার্টি দিয়েছিলে বাসায়। সবাই চলে যাওয়ার পর সে রাতে তুমি আর মা কী নিয়ে যেন ঝগড়া করেছিলে। সেই ঝগড়ায় আমি জেনে গেলাম, আমি আমার মায়ের পেটে এসেছিলাম অন্য এক পুরুষ কর্তৃক, যে পুরুষটা ছিল তোমার উঁচুতলার আশ্রয়, আর মা ছিল তার সিঁড়ি।

সঙ্গে সঙ্গে নিমিষেই বুকের ভেতরটা শূন্য হয়ে গেল বাবা, চারদিকে শূন্যতার কী বাড়াবাড়ি রকমের ছড়াছড়ি। যেদিকে তাকাই কেবল ফাঁকা আর ফাঁকা। রাতভর কেঁদেছি বাবা সেদিন এবং এক সময় সিদ্ধান্ত নিলাম—একজন অশুদ্ধ এবং অসুখী মানুষ হিসেবে বেঁচে থেকে কী লাভ, আমি আত্মহত্যা করব। কিন্তু আত্মহত্যার ঠিক আগে আরেকটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম আমি। একটা সুখী মানুষকে খুঁজে বের করব, তারপর খুন

করে ফেলব তাকে। কিন্তু খুন করার আগে তাকে দুটো কথা বলব আমি—

মাননীয় সুখী আত্মা, আপনার শরীরে যে রক্ত আছে, সে রকম লাল রক্ত আমার শরীরেও। কেবল আপনার শরীরের রক্তগুলো বৈধ পথে আসা, আর আমারটা অবৈধ পথে। বিষবৃক্ষের ফলও নাকি বিষ হয়। জনক-জননীর অমার্জনীয় কর্মফল—এই আমি, তাদের পাপের দায়, তাদের পাপের সৃষ্টিকে আজ দেখাতে এসেছি আপনাদের।

কিন্তু জানো বাবা, অন্যভাবে এ পৃথিবীতে আসা, অন্যরকম এই আমি, মৃত্যুকে সহোদর ভেবে অনেকের কাছে গিয়েছি। আমি তাদের অস্তিত্ব স্পর্শ করে দেখেছি, তারা আমার মতোই এক একটি অসুখী সংস্করণ। কেউ সুখী নয় বাবা, কেউ না।

আমার আর খুন করা হয়ে ওঠে না। প্রতিশোধ নেওয়া হয়ে ওঠে না স্রষ্টার ওপর, যে স্রষ্টা ভুল পথে আমাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আচ্ছা বাবা, স্রষ্টা কি আছে? স্রষ্টা কি সত্যি আছে? আছে তো?

পাপে সৃষ্ট আমার এই দেহ-আত্মা কেবল কাঁদে, লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে, নীরবে কাঁদে। একটা কিছু ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করে বাবা, কেবল ইচ্ছে করে মামুলি একটা ইচ্ছে। ভীষণ ইচ্ছে করে।

বাবা দেখো, একদিন আকাশের ওই ওপার থেকে স্রষ্টাকে ঠিকই এই মাটির পৃথিবীর মাটির মানুষের মাঝে টেনে নিয়ে আসব। তারপর তার সামনে হাঁটু মুড়ে বসে বলব, প্রভু, কী প্রচণ্ড শক্তি তোমার, কী অসীম ক্ষমতা তোমার! এই যে তোমার এত শক্তি, এত ক্ষমতা তোমার, তাহলে পৃথিবীর সবাইকে সুখী করো না কেন তুমি, কেন সমান করে গড়ে তোল না একসঙ্গে। তুমি মস্ত বড় এক খেলোয়াড় প্রভু, তোমার সৃষ্টিকে নিয়ে খেলতে তুমি বড্ড ভালোবাসো। ছিঃ প্রভু, ছিঃ।

চিঠিটা লিখে ছিঁড়ে ফেলেছিল রাশীক। কারণ সে চিঠিটা বাবাকে দিতে ইচ্ছে করেনি তার। কী হতো সেটা দিয়ে।

বাবা একটু ধমকের স্বরে বলেন, 'বললে না, কিসের চিঠি?'

'চিঠিটা আমি ছিঁড়ে ফেলেছি বাবা।'

'কী ছিল সে চিঠিতে?'

'আমার জন্মবৃত্তান্ত।'

'জন্মবৃত্তান্ত মানে?'

'আমার স্বপ্নরহস্যের কথা।'

বাবা কী একটা বলতে নেন, কিন্তু বলতে পারেন না। রাশীকও আর দাঁড়িয়ে

থাকে না। আস্তে আস্তে ঘর থেকে বের হয়ে দাদুর ঘরের দিকে যায়।

বিছানায় শুয়ে আছেন দাদু। রাশীকের পায়ের আওয়াজ পেয়েই উঠে বসেন তিনি। ক্লান্ত গলায় তারপর বলেন, 'রাশীক?'

'হ্যাঁ দাদু।'

'ইদানীং কোথায় যে থাকিস, দেখাই পাই না তোর!'

দাদুর পাশে বসতে বসতে রাশীক বলে, 'আর মাত্র কয়েকটা দিন দাদু।'

'তোর মানুষ খোঁজা হলো?'

'হচ্ছে দাদু।'

সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে রাশীককে ধরে দাদু বলেন, 'তোকে একটা কথা বলতে চাচ্ছি রে।'

রাশীক দাদুর হাতটা চেপে ধরে বলে, 'বলো।'

'গ্রাম থেকে তোর যে একটা দাদা এসেছে, ওর একটা কাজ করে দে না।'

'কোন কাজটা দাদু?'

'ওই যে পেনশনের কাজটা।'

'এখনো হয়নি?'

'না।'

নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে রাশীক কী যেন ভাবে। তারপর বলে, 'দেখি, কী করতে পারি।'

'তোর বাবার কথা বললে কাজটা তাড়াতাড়ি হয়ে যেতে পারে।'

দাদুর দিকে গভীর চোখে তাকিয়ে রাশীক বলল, 'বাবার কথা বলতে হবে কেন?'

'না, এমনি বললাম।'

রাশীক আগের চেয়েও গম্ভীর গলায় বলল, 'না, বাবার কোনো প্রয়োজন হবে না, সেটা আমার জন্যও না, তোমার জন্যও না, অন্য কারো জন্য না।'

দপ দপ করে হেঁটে ঘরে ঢুকে কাজের মেয়েটি বলল, 'ভাইয়া, আপনার বন্ধুরা এসেছে।'

'কোথায়?'

'আপনার ঘরে বসে আছে।'

দাদুকে আবার শুইয়ে দিয়ে রাশীক ওর নিজের ঘরে এলো। ত্রিদিব আর মিমি বসে আছে ওর বিছানায়। রাশীককে দেখেই ত্রিদিব একটু সোজা হয়ে বসে বলল, 'একটা ঘটনা শুনেছিস?'

রাশীক নিস্পৃহ গলায় বলল, 'কী?'

'তিন মাসের একটা শিশুকে বিক্রি করে দিয়েছে তার মা।'

'কবে?'

'এই তো পরশুদিন।'

'কেন?'

'অভাবের তাড়নায়। ত্রিদিব একটু থেমে বলে, 'শিশুটির দাম কত, জানিস?'

'কত?'

'চার হাজার টাকা আর একটি গাভী।'

'শিশুদের নিয়ে মাঝে মাঝেই অনেক ঘটনা শোনা যায়। দুই বছরের শিশু ডাকাতি মামলার আসামি হয়, কোনো শিশুকে আবার দুধের সঙ্গে এসিড মিশিয়ে খাওয়ানো হয়, আরো অনেক রকমের ঘটনা ঘটে। শিশুদের নিয়ে আমরা অন্যরকম একটা পরিকল্পনা করব।' রাশীক মিমির দিকে তাকিয়ে বলে, 'মিতু আসেনি কেন?'

'ওর নাকি কী একটা কাজ আছে।' মিমি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলে, 'আ-মরা এবার কোথায় যাচ্ছি?'

'ময়মনসিংহে।' কথাটা বলেই রাশীক জানালার পাশে দাঁড়ায়, 'মাঝে মাঝে মনে হয় কী, জানিস— জীবনটা অনেক সুন্দর।'

'আমারও মনে হয়।' মিমি রাশীকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলে।

'কিন্তু জীবনটা কি আসলে সুন্দর? এই যে বিচিত্র সব মানুষ দেখছি আমরা, অদেখা রয়ে যাচ্ছে আরো কত বিচিত্র জীবন। হয়তো এর চেয়েও ভয়ঙ্কর, এর চেয়েও মর্মান্তিক!'

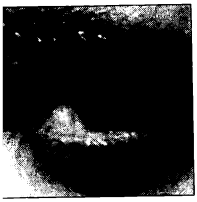

ব্যাপারটা সে বেশ কয়েক দিন ধরেই খেয়াল করেছে, কিন্তু তেমন পাত্তা দেয়নি কখনো। বাড়ি থেকে বের হয়ে সেই যে মাথাটা নিচু করত সে, টানা ছয় কিলোমিটার হেঁটে স্কুলে পৌঁছে তারপর উঁচু করত মাথাটা। এর মধ্যে যত যা-ই ঘটুক, কোনো কিছুই সে খেয়াল করত না, খেয়াল করতে চাইত না। কারণ, বাবা মারা গেছেন সেই কবেই, এখন মা-ই তার সবকিছু, স্কুলে যাওয়ার সময় সেই মা প্রতিদিন মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, 'মাথা নিচু করে স্কুলে যাবি, মাথা নিচু করে বাসায় আসবি। কোনো দিকে খেয়াল করবি না, কেউ কিছু বললে তাকাবি না, কিছু বলবিও না।'

স্কুলে আসতে আসতে একদিন সে টের পায়, কিছু ছেলে তার পিছু নিয়েছে। সে কেমন যেন ভয় পেয়ে যায় কিন্তু কিছু বলে না। মাথা নিচু করে স্কুলে আসতে থাকে। এরই মধ্যে পেছন থেকে একটা ছেলে গেয়ে ওঠে—পড়ে না চোখের পলক, কী তোমার রূপের ঝলক...। ছেলেটা গান গায়, অন্য ছেলেরা হাসে, বেশ শব্দ করে হাসে।

স্কুলে পৌঁছেই সে কেমন যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। কিন্তু ক্লাসে বসে কোনো মনোযোগ দিতে পারে না। সারাক্ষণ ছটফট করতে থাকে সে। পাশ থেকে তার এক বান্ধবী বলে, 'কী হয়েছে তোর?'

'আমার না ভালো লাগছে না।'

সঙ্গে সঙ্গে কপালে হাত দেয় বান্ধবী, 'কই, কোনো জ্বর-টর তো নেই। কী হয়েছে তোর?'

'জানি না।'

'জানিস না তো খারাপ লাগছে কেন?'

'বুঝতে পারছি না।'

'কেউ কি তোকে কিছু বলেছে?'

'না।'

'কোনো ভয় দেখায়নি তো কেউ?'

'না।'

'তাহলে?'

'জানি, কী হয়েছে আমার।' নিজের প্রতি নিজেই যেন বিরক্ত হয় মেয়েটি।

স্কুল শেষে বাড়ি ফেরার সময় সে আবার সংকুচিত হয়ে যায়। সারা রাস্তা ভয়ে ভয়ে আসতে থাকে সে। শিমুল গ্রামের তিন রাস্তার মেড়ে এসে সে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। তাকিয়ে দেখে, সকালের ছেলেগুলোর মতো কয়েকটা ছেলে ওপাশের রাস্তা দিয়ে এদিকে আসছে। বুকের ভেতর ধড়ফড় শুরু হয়ে যায় তার। কিন্তু না, ছেলেগুলো পাশ কেটে চলে যায়, কিছু বলে না, কোনো গানও গায় না তাকে শুনিয়ে, হাসেও না সবাই মিলে।

মেয়েটা গভীর একটি নিঃশ্বাস নেয়, এ ছেলেগুলো সকালের ছেলেগুলোর মতো না, আর সব মানুষই খারাপ না।

আবার পথ হাঁটতে থাকে সে। আজ বেশ দেরি হয়ে যাবে বাড়ি পৌঁছাতে, মা রাগ করবেন ভীষণ।

বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে সেদিন সত্যি সত্যি দেরি হয়ে যায় তার। মা তাকে দেখে প্রায় লাফিয়ে এসে বলেন, 'এত দেরি করলি কেন মা?'

'জানি না মা।'

'জানিস না মানে? রাস্তায় কিছু হয়েছিল?'

'না।'

'স্কুলে?'

'না।'

'তাহলে দেরি করলি কেন?'

মেয়েটা এবার মুখটা ফ্যাকাসে করে বলে, 'মাথাটা কেমন যেন করছিল মা, জোরে হাঁটতে পারি নাই, তাই আসতে দেরি হয়েছে।'

মা গভীর চোখে মেয়ের দিকে তাকান। তারপর আস্তে আস্তে কাছে এসে মেয়ের কপালে হাত রাখেন। কিছুক্ষণ রেখেই কপালটা কুঁচকে বলেন, 'গা তো গরম তোর। যা যা তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে আয়। খাওয়া-দাওয়া করে ওষুধ খাবি।'

রাতে পড়তে বসে মেয়েটার আর পড়া হয় না। সারাক্ষণ সে ভাবতে থাকে স্কুলে যাওয়ার কথা। মানুষ এমন হয় কেন? ভাবতে ভাবতে রাত আরো গভীর হয়, কিন্তু তার একটুও পড়া হয় না।

ঘুমও হয় না তার। একসময় যাওবা একটু ঘুম আসে, কিন্তু হঠাৎ ঘুমটা

ভেঙে যায় তার। ঘুমের মাঝে সে দেখে—কতগুলো সাপ তাকে তাড়া করেছে, সে যতই দৌড়ে পালাতে চাইছে, কিন্তু দৌড়াতে পারছে না সে, পালাতেও পারছে না।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই সে তার মাকে বলে, 'মা, আজ আর স্কুলে যাব না।'

মা কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে বলেন, 'কেন?'

'ভালো লাগছে না মা।'

'ভালো না লাগলেও যেতে হবে মা, কদিন পর তোর পরীক্ষা না?' মা মাথায় হাত বোলাতে থাকেন মেয়ের।

বাড়ি থেকে বের হতেই বুকটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে ওঠে তার। মাথা নিচু করে হাঁটতে থাকে সে। বেশ কিছুদূর আসার পর সে চমকে ওঠে। রাস্তার কিছু গাছগাছালির পাশ থেকে গতকালের সে গানটা ভেবে আসে—পড়ে না চোখের পলক, কি তোমার রূপের ঝলক।

মেয়েটা থমকে দাঁড়াতে নিয়ে পা দুটো একটু দ্রুত চালায়। কিছুদূর যাওয়ার পর সে টের পায়—গতকালের মতো আজও পিছু নিয়েছে কেউ কেউ। ওরা হাততালি দিচ্ছে, গান গাচ্ছে, হাসাহাসি করছে।

হঠাৎ বুকের ভেতরটা দুমড়ে ওঠে তার। অসম্ভব খারাপ একটা কথা বলছে একটা ছেলে। কথাটা কানে যাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন ঝিঁঝি করছে কানটা।

ছেলেটা আবার সেই খারাপ কথাটা বলে। মেয়েটা এবারও কথাটা শুনে না শোনার ভান করে। সে বরং পা দুটো আরো জোরে চালায়। কিন্তু বেশি দূর যেতে পারে না। আরেকটা ছেলে এসে খপ করে তার একটা হাত ধরে। মেয়েটা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে যায় এবং ভীত চেহারা নিয়েই সে বলে, 'হাত ধরলেন কেন আমার?'

পিশাচের মতো হাসতে হাসতে ছেলেটি বলে, 'আমার ইচ্ছে।'

'হাত ছাড়ুন বলছি!'

'যদি নাছাড়ি?'

'চিৎকার করব আমি।'

আগের চেয়েও পৈশাচিক হাসি হাসতে হাসতে ছেলেটি বাংলা সিনেমার ভিলেনের মতো বলে, 'চিৎকার করে কিছু হবে না সুন্দরী, কেউ তোমাকে বাঁচাতে আসবে না।'

মেয়েটা হঠাৎ বুঝতে পারে তার কানে আর কিছু ঢুকছে না, কিছুই বুঝতে

পারছে না সে, চিৎকার করার শক্তিও সে হারিয়ে ফেলেছে। কেমন যেন ভারসাম্যহীন হয়ে যায় সে। তার এ অবস্থা দেখে ছেলেগুলোও একটু ভয় পায়। তার হাত ছেড়ে দিয়ে চলে যায় তারা।

সেদিন আর স্কুলে যাওয়া হয় না। বাড়িতে ফিরে আসে সে। মা তাকে দেখে ভীষণ অস্থির হয়ে যান, 'কী হয়েছে তোর?'

মেয়েটা কিছু বলে না, মায়ের কোলে মাথা রেখে অজ্ঞান হয়ে যায় সে। তিন দিন আর স্কুলে যাওয়া হয় না তার। আশপাশের কয়েকজন বান্ধবী এসে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করে, সে কিছুই বলে না।

প্রতিদিন খেতে বসার সময় মা বলেন, 'তুই কি আমার কাছে কিছু গোপন করছিস?'

মেয়ে ভাবলেশহীনভাবে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলে, 'তোমার কাছে আমি কী গোপন করব?'

'তাহলে এমন হয়ে যাচ্ছিস কেন তুই?'

'কেমন হয়ে যাচ্ছি আমি?'

'ঠিকমতো স্কুলে যাস না, লেখাপড়া করিস না।'

'ঠিক আছে, কাল থেকে স্কুলে যাব।'

ভীষণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেয়েটি আবার স্কুলে যেতে শুরু করে। তিন দিন পর স্কুলে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে কত দিন পর স্কুলে যাচ্ছে সে। পথটাও কেমন অচেনা মনে হচ্ছে তার।

দু মাইল আসার পর সে আজকেও থমকে দাঁড়ায়। তবে আগের চেয়ে বেশি ভয় পেয়ে যায় আজ। রাস্তার পাশে কয়েকটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে, তার মাঝে বেলালও দাঁড়িয়ে আছে। যে বেলাল এক বছর আগে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল।

কাঁপা কাঁপা পায়ে সে তাদের সামনে দিয়ে স্কুলের দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎ বেলাল সামনে এসে বলে, 'কী, চিনতে পারছ আমাকে?'

মেয়েটা মাথা নিচু করেই থাকে। কোনো কথা বলে না।

'কী, বোবা হয়ে গেছ নাকি? বোবা হইলে কও, ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই।' সবাই একসঙ্গে হাসতে থাকে।

'আপনি পথ ছাড়েন।' মেয়েটি এই প্রথম কথা বলে।

'ওই—।' সবাইকে উদ্দেশ করে বেলাল বলে, 'আরে বোবা হয় নাই। মুখে কথা ফুটছে।' বেলাল আবার মেয়েটির দিকে তাকায়, 'যদি পথ না ছাড়ি?'

মেয়েটি আর কিছু বলে না। সে স্কুলের দিক থেকে বাড়ির দিকে ঘুরে

দাঁড়ায়। কিন্তু তার আগেই বেলাল এসে আবার সামনে দাঁড়ায়, 'কী কই যাও?'

'বাড়িতে যাব।'

'কার বাড়ি?'

'কার বাড়ি আবার, আমাদের বাড়ি।'

'আমার বাড়ি গেলে কেমন হয়?'

'আপনার বাড়ি যাব কেন?'

'তাও তো কথা, যাবা কেন? সেই জন্যই তো তোমারে বিয়ার কথা বলছিলাম, কিন্তু তুমি রাজি হও নাই। আজ যদি আমি জোর করে তোমারে নিয়া যাই?' বেলাল হাসতে থাকে।

বেশ কিছুক্ষণ হাসাহাসি করার পর বেলাল চলে যায়, কিন্তু রয়ে যায় বাকি ছেলেগুলো। তারা মেয়েটিকে জোর করে অশালীন ভঙ্গিতে অনেকগুলো ছবি তোলে। তারপর ছেড়ে দেয় তাকে।

মেয়েটির আজ স্কুলে যাওয়া হয় না। বাড়িতে ফিরে আসে সে। কিন্তু বাড়িতে এসেই সে ভয়ঙ্কর একটা কথা শোনে—বেলালের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাবে রাজি না হলে সেসব ছবি সিডিতে কপি করে বাজারে ছাড়া হবে এবং জনসমক্ষে প্রচারও করা হবে ছবিগুলো।

'অবশেষে তুমি তোমার এলাকা ছেড়েছ?' দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে মিতু মেয়েটিকে বলে।

'হ্যাঁ আপু, এ ছাড়া আমার কোনো উপায় ছিল না।' মেয়েটি ভেজা ভেজা কণ্ঠে বলে।

'তোমরা ওই বখাটেদের বিরুদ্ধে কিছু করার চেষ্টা করোনি?' ত্রিদিব একটু সোজা হয়ে বসে।

'করেছি। ওদের অভিভাবকদের ঘটনাটা জানালে তারা বরং উল্টো বোঝে আমাদের ওপর। খেপে যায় তারা।'

'তোমার স্কুলের শিক্ষকরা কিছু করেননি?' রাশীক মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলে, 'কিংবা তোমার প্রতিবেশীদের কেউ?'

'আমার স্কুলের স্যাররা করেছেন, কিন্তু তারা কোনো গুরুত্বই দেয়নি।'

মিমি অনেকক্ষণ চুপ থেকে গভীর একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, 'তুমি এখন কী করবে?'

'শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীকে আমি একটা চিঠি লিখেছি। জানি না কী হবে এখন?' মেয়েটি হঠাৎ কেমন যেন ডুকরে কেঁদে ওঠে, 'আচ্ছা, আমাদের প্রধানমন্ত্রী একজন মেয়ে, আমাদের বিরোধীদলীয় নেত্রীও একজন মেয়ে, তিনি কি

আমাদের মতো দুর্দশাগ্রস্ত মেয়েদের কথা জানেন? যদি না জেনে থাকেন, তাহলে তিনি কিসের প্রধানমন্ত্রী, কিসের বিরোধীদলীয় নেত্রী?'

ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপজেলায় নূরুল আমিন খান স্কুলের নবম শ্রেণীর এই ছাত্রীটি হয়তো অনেক কিছু জানে। কেবল জানে না—এত কিছু জানলে কখনো প্রধানমন্ত্রী হওয়া যায় না, বিরোধীদলীয় নেত্রী হওয়া যায় না। সারা দেশের মানুষ যত বিপদেই থাকুক, তাদের জন্য রয়েছে বুলেটপ্রুফ গাড়ি, আর জনগণের টাকায় রাখা নিরাপদ পাহারাদার। কে না জানে—যারা মানুষের মাথায় ওপর বসে থাকে, তারা কখনো সে মানুষদের দুঃখের কথা শোনে না, তাদের কষ্টের কথা জানে না, এমনকি তাদের চোখের দিকেও তাকায় না। পাছে তাদের নির্লজ্জ চোখগুলো সাধারণ মানুষ দেখে ফেলবে!

'তুই কি বাইরে যাচ্ছিস?'

রাশীক বাইরে যাওয়ার জন্য রেডি হচ্ছিল, পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে রিসাদ ভাইয়া দাঁড়িয়ে আছে। ভাইয়ার দিকে একটু এগিয়ে এসে বলে, 'হ্যাঁ।'

ভাইয়ার দিকে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে তাকাল রাশীক। এবং এই প্রথম তার মনে হলো তার একজন বড় ভাই আছে, যার কাছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সে আশ্রয় নিতে পারত।

'ভাইয়া, তুমি কি কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ, একটা কথা বলতে এসেছিলাম।'

'বলো।'

'আচ্ছা, এই যে আমি, এই যে আমি প্রতিদিন নেশা করি, আমাকে ঘৃণা লাগে না তোর?'

'নেশাখোরদের মানুষ ঘৃণা করে, এটা তুমি জানো?'

'জানি।'

'তাহলে নেশা কর কেন?'

'আমি নিজেও জানি না, কেন নেশা করি।'

'হ্যাঁ, মানুষ যখন নেশা শুরু করে, তখন সে জানে না সে একজন সত্যিকারের নেশাখোর হয়ে যাবে।' রাশীক খুব নরম গলায় বলে, 'তোমার কি কোনো কারণে আজ মন খারাপ ভাইয়া?'

'মন তো প্রতিদিনই খারাপ থাকে।' মাথাটা নিচু করে ফেলে রিসাদ।

'তোমাকে কখনো আমি কোনো কিছু নিয়ে অনুরোধ করিনি, তোমাকে আজ একটা অনুরোধ করব আমি।' রাশীক রিসাদের দিকে আরো একটু এগিয়ে গিয়ে বলে, 'বলো, অনুরোধটা রাখবে।'

'তোর অনুরোধ তো, আমি রাখব?'

'তুমি কথা দিচ্ছ কিন্তু ভাইয়া।'

'হ্যাঁ, আমি কথা দিচ্ছি।'

'তুমি কি তোমার নেশার জীবন থেকে ফিরে আসবে?'

রিসাদ রাশীকের দিকে গভীর চোখে তাকায়। কেমন যেন কাঁপতে থাকে সে। তারপর অসম্ভব কাঁপা কাঁপা গলায় বলে, 'তুই কি আমাকে একটু সাহায্য করবি?'

রাশীক ঝট করে ভাইয়া একটা হাত চেপে ধরে বলে, 'অবশ্যই ভাইয়া, অবশ্যই। বলো, তোমার জন্য আমি কী করতে পারি!'

'কিছু না রে। জীবনে অনেক কিছু পেয়েছি, কিন্তু প্রকৃত ভালোবাসা পেলাম না কোথাও। যদি একটু ভালোবাসা পেতাম!'

রাশীক শব্দ করে কেঁদে ওঠে। ভাইয়া, এটা কী বলছ—এটা তো তার কথা! এক জীবনে মানুষের কতটুকু ভালোবাসা প্রয়োজন? একটু, একটু ভালোবাসা হলেই মানুষ সমুদ্র পাড়ি দিতে পারে সাঁতরে, একটু ভালোবাসা পেলে মানুষ আজন্ম বদলে দিতে পারে নিজেকে, একটু ভালোবাসার স্পর্শে অনেক মৃত গাছ মুহূর্তে সজীব হতে পারে সবুজ পাতায়।

'তুই কাঁদছিস?'

'না ভাইয়া, তোমার জন্য আমার কষ্ট হচ্ছে।'

'আমার জন্য কোনো কষ্ট করিস না।'

'ভাইয়া, চলো আমরা নতুন করে জীবনটা শুরু করি।'

'তুই আমার পাশে থাকবি তো?'

'আমি থাকব, দাদু থাকবে, আমার বন্ধুরা থাকবে। সব ভালো মানুষগুলো তোমার পাশে থাকবে। তুমি একবার শুধু নিজেকে জাগিয়ে তোলো, দেখবে সমস্ত পৃথিবী তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

'কত দিন আমি বুকভরে নিঃশ্বাস নিতে পারিনি।'

'এখন থেকে পারবে ভাইয়া। ঘুম থেকে উঠে একদিন সোজা জানালার কাছে যাবে। জানালা খুলে বাইরে তাকাবে, খুব মনোযোগ দিয়ে তাকাবে। তুমি দেখবে—সমস্ত প্রকৃতি তোমার দিকে চেয়ে আছে। তুমি আরো একটু মনোযোগ দিলে দেখবে, তারা তোমাকে দেখে হাসছে, তোমাকে ওয়েলকাম জানাচ্ছে।'

রিসাদ চলে যাচ্ছিল। রাশীক দ্রুত এগিয়ে গিয়ে তার একটা হাত ধরে বলে, 'প্রত্যাখ্যানের কষ্ট কতটুকু, এটা প্রায় প্রতিটি মানুষই জানে। প্রতিটি মানুষ কোনো না কোনোভাবে একটা কিছু দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়। তার পরও মানুষ বেঁচে থাকে না, হাসে না, গান গায় না, কোনো রঙিন গোলাপ ছুঁয়ে আনন্দ অনুভব করে না? করে। যারা এগুলো পারে না, তারা বড় অবুঝমানুষ, বড় ছেলেমানুষ।'

'এসব বলছিস কেন তুই?'

'এমনি ভাইয়া।'

'তুই কি রুনীর কথা কিছু জানিস?'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ হয়ে থাকে রাশীক, কিছু বলে না। তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে খুব শান্ত গলায় বলে, 'হ্যাঁ জানি।'

'কীভাবে?'

'রুনী আপু আমাকে ফোন করেছিল।'

'কবে?'

'পরশু।'

'কখন?'

'বিয়ের ঠিক দু-তিন ঘণ্টা আগে হবে।' রাশীক কথাটা বলে রিসাদের একেবারে সামনে এসে দাঁড়ায়, 'একটা মানুষ তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে, যে যাওয়ার যাবেই। তুমি কি একবার একটু ভাববে, সে কেন তোমাকে ছেড়ে গেল? তোমার ভাবনায় তুমি যদি জেনে যাও–তোমার ভুলটা কী, তাহলে তোমার উচিত হবে, সেই ভুলটাকে ছেড়ে আসা। মানুষ সব পারে ভাইয়া, স-ব।'

'আমার একমাত্র ভুল, আমি নেশা করি।'

'এই নেশা করার জন্য তোমার সমস্ত ভালোবাসা নিয়ে একটা মানুষ চলে গেল, তুমি কি তবু সে ভুলটা আবার করবে?' রাশীক রিসাদের একটা হাত চেপে ধরে বলে, 'আমি জানি, তুমি তা করবে না। এই যে, একটা মানুষ চলে গেল, আমি এলাম তোমার কাছে, আমাদের বারান্দায় ফুলের টবের গাছগুলোও তোমার জন্য, আমাদের সবার ভালোবাসা তোমার জন্য! ভালোবাসা সবাই পায় না ভাইয়া, কেউ কেউ পায়। সে ভালোবাসা আঁকড়ে ধরতে হয়, বুকের ঠিক মাঝখানে তাকে জায়গা দিতে হয়, মাঝে মাঝে সেটা আবার কাউকে কাউকে বিলিয়ে দিতে হয়।'

'আমি এখন যাই রে।'

'যাবে?' রাশীক ছলছল চোখে রিসাদের দিকে তাকিয়ে বলে, 'তোমাকে আমি খুব ভালোবাসি ভাইয়া।'

দাদুর ঘরে ঢুকেই রাশীক দেখে, গ্রাম থেকে আসা সেই দাদা বসে আছেন। দাদুর সঙ্গে কথা বলছেন। রাশীক একটু এগিয়ে গিয়ে বলল, 'দাদা, আপনি রেডি তো?'

'হ্যাঁ।'

'চলুন যাই।'

রাশীক বাইরে বের হওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই দাদু বললেন, 'খেয়েছিস

রাশীক?'

হাসতে হাসতে রাশীক দাদুর পাশে বসে বলে, 'কী সুন্দর অন্ধ তুমি! তোমার সৌভাগ্য, তুমি কোনো ঘুষখোরের চেহারা দেখবে না আজ। কিন্তু আমি দেখব। তোমার অন্ধ এ চোখ দুটো দেখে মাঝে মাঝে আমার ভীষণ ঈর্ষা হয় দাদু। যদি আমিও তোমার মতো অন্ধ হতে পারতাম!'

দাদু কিছুটা ধমকে উঠে বলেন, 'এসব কী বলছিস তুই!'

'সত্য কথা বলছি দাদু।' রাশীক হাসতে হাসতে বলে, 'একজন ঘুষখোরের চেহারা দেখার চেয়ে অন্ধ হওয়া অনেক ভালো দাদু, অনেক ভালো।'

'তাই!' দাদুও হাসতে থাকেন, 'একজন ঘুষখোরকে দেখতে হবে না আমার, কিন্তু আমি তো উড়ে যাওয়া প্রজাপতি দেখাতে পাই না, লাল টকটকে গোলাপ দেখতে পাই না, সবুজ ঘাস দেখতে পাই না, নীল ঘাসফুল দেখতে পাই না, আকাশ দেখতে পাই না, চাঁদও দেখতে পাই না।'

'সে জন্য তুমি আফসোস করতে পার। কিন্তু সে আফসোসের চেয়ে বড় আনন্দ হচ্ছে–তোমাকে তোমার কাছের মানুষদের অধঃপতন দেখতে হচ্ছে না।'

হাইকোর্টের পাশের অফিসটার কাছে এসে রাশীক দেখে—ত্রিদিব, মিমি আর মিতু আগেই এসে গেছে। ওরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। রাশীক দাদাকে দেখিয়ে ওদের বলল, 'ইনি হচ্ছেন আমার দাদা। আর—।' রাশীক ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই হচ্ছে মিমি, ত্রিদিব আর মিতু। আমার বন্ধু।'

ওরা দাদাকে সালাম দিল। চমৎকারভাবে দাদা বললেন, 'মানুষ এখনো সালাম দেয় মানুষকে, ভালো লাগল।'

দাদাকে নিয়ে ওরা অফিসটির পাঁচতলায় উঠল। তারপর দাদাকে বলল, 'কোন রুমটা?'

দাদা হাত দিয়ে রুমটা দেখিয়ে দিলেন। রাশীক দাদাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে ভেতরে ঢুকল। সঙ্গে ঢুকল ত্রিদিব, মিমি আর মিতুও। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রাশীক খুক, করে একটু কাশি দিয়ে বলল, 'যদিও ভেতরে ঢুকে পড়েছি আমরা, তবু অনুমতি নিচ্ছি, আমরা কি আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে পারি?'

টেলিফোনে কথা বলছিলেন বড় টেবিলের পাশের লোকটি। হাত দিয়ে ইশারা করে তিনি রাশীকদের ভেতর আসতে বললেন। রাশীকরা ভেতরে এসে দাঁড়িয়ে রইল। লোকটি আবার ইশারা করে সামনের চেয়ারগুলোতে বসতে বললেন ওদের।

বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকার পর রাশীকরা খেয়াল করল—লোকটি ফোনে

কথা বলতে খুব পছন্দ করেন। প্রায় বিশ মিনিট তিনি ফোনে কথা শেষ করে মিমির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনারা—?'

'একটা কাজে এসেছি আমরা।' মিমি কিছু বলার আগেই রাশীক বলল।

'বলুন।'

রাশীক একটু উঠে দাঁড়িয়ে ওর কোমরের কাছ থেকে রিভলবারটা বের করে টেবিলে রাখতে রাখতে বলল, 'ভয় পাবেন না প্লিজ। আপনি বলতে পারেন এটা আমি কোথায় পেলাম? এক দিনের জন্য ধার করা হয়েছে একটা। আপনি নিশ্চয় জানেন, এ ধরনের জিনিস ইদানীং খুব সহজলভ্য।'

'আপনারা আসলে কী চান?' লোকটার গলাটা কেমন যেন কেঁপে উঠল।

'আপনার নিশ্চয় কোনো সন্তান আছে, আমরা আজ তাকে ডেকে এনে আপনাকে দেখিয়ে বলতে পারতাম—তোমরা কি জানো, তোমাদের বাবা একজন ঘুষখোর? অথবা কোনো গুণীজনকে ডেকে এনে বলতে পারতাম—জানেন, এ লোকটা না একজন বৃদ্ধ মানুষের পেনশনের টাকা দিতে চাচ্ছে না। কিংবা কোনো কিছু না-বলে এই রিভলবার দিয়ে আপনার মাথাটা ফুটো করে দিতে পারতাম। আপনি এটাও নিশ্চয় জানেন—মানুষ মারাটা এ দেশে এখন খুবই সহজ, এমনকি রাস্তার কুকুর মারার চেয়েও।'

'আপনারা এসব কী বলছেন, আপনারা কী চান সেটা আগে বলুন।'

'হ্যাঁ, সেটা বলার জন্যই তো এসেছি।' রাশীক উঠে গিয়ে অফিসরুমের বাইরে থেকে দাদাকে ডেকে আনল। দাদাকে দেখেই লোকটা কেমন যেন সংকুচিত হয়ে গেল। রাশীক দাদাকে পাশের একটা চেয়ারে বসিয়ে লোকটিকে বলল, 'এ মানুষটাকে চিনতে আপনার কোনো কষ্ট হওয়ার কথা নয়।' রাশীক একটু থেমে বলল, 'এবার আপনি বলুন, বৃদ্ধ বয়সে একটা মানুষের পেনশনের টাকা তুলতে যদি এত কষ্ট করতে হয়, তাহলে মানবতার মূল্য রইল কোথায়? একটা মানুষ সারা জীবন শিক্ষকতা করে এসেছেন, অবসর নিয়েছেন, তার পরও তার পেনশনের টাকা তুলতে দিনের পর দিন ঘুরতে হয়। কেন?'

'আমার চাই, আপনি আজ অথবা আগামীকালের মধ্যে এ বৃদ্ধ লোকটাকে মুক্তি দেবেন।' মিমি খুব রূঢ় স্বরে বলল, 'এটা আপনার কাছে আমাদের অনুরোধ না, এটা আমাদের চাওয়া।'

ত্রিদিব একটু সোজা হয়ে বসে, 'আপনার লজ্জা করে না, বাবার বয়সী একটা লোকের কাছ থেকে হাত পেতে ঘুষ নিতে? আপনি একজন ঘুষখোর, আপনার ছেলেমেয়েরা তাহলে কী হবে? আপনার মুখ দেখে আপনার ছেলেমেয়েরা কখনো বলে না–বাবা, তোমাকে জানোয়ারের মতো দেখাচ্ছে কেন!'

চাপাতির প্রথম কোপটি যখন তার হাতের আঙুলে লাগল, ঠিক তখনই থমকে গেল সে। শূন্য দৃষ্টি মেলে সামনের দিকে তাকাল। অস্পষ্টভাবে ভেসে উঠল বাবার মুখটা। হাসি হাসি মুখ করে এগিয়ে আসছেন তিনি, যেন তার হাতটি ধরে এখনই কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাবেন বাবা।

বাবা প্রতিদিন সকালে তাকে নিয়ে বেড়াতে যেতেন। তার হাত ধরে বাবা হাঁটতেন আর বলতেন—সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারা দিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি। সঙ্গে সঙ্গে সেও আধো আধো স্বরে বলত—সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারা দিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।

বাবার হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে সে মাঝে মাঝেই থমকে দাঁড়াত। ঘাসের ডগার শিশির দেখে অবাক হয়ে বলত, 'বাবা, এগুলো কী?'

বাবা বলতেন, 'শিশির।'

'শিশির কী বাবা?'

'শিশির হচ্ছে পানি।'

'এ পানিগুলো কোথা থেকে আসে?'

'আকাশ থেকে।'

'আকাশ থেকে কেন আসে?'

'আকাশ কাঁদে তো!'

'আকাশ কাঁদে কেন?'

'আকাশের অনেক দুঃখ।'

'আকাশের অনেক দুঃখ?' সে কী যেন ভাবতে থাকে, তারপর বলে, 'আকাশের বাবা আকাশকে চকলেট কিনে দেয় না?'

'দেয়।'

'তাহলে ও কাঁদে কেন?'

বাবা এ কথাটার জবাব দিতে পারেন না। তিনি ছেলের হাত ধরে আবার

হাঁটতে থাকেন। কিছুদূর যাওয়ার পর সে আবার থমকে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে বাবাও থমকে দাঁড়ান। বিশাল বটগাছটার নিচে দাঁড়িয়ে সে অপলকভাবে তাকিয়ে থাকে গাছটার দিকে। তারপর বটের ঝুরির দিকে অবাক দৃষ্টি মেলে বলে, 'বাবা, এগুলো কি গাছের দাড়ি?'

বাবা হাসতে হাসতে বলেন, 'হ্যাঁ, এগুলো গাছের দাড়ি।'

'বাবা, এটা কী গাছ?'

'বটগাছ।'

'শুধু কি বটগাছেরই দাড়ি হয় বাবা?'

'হ্যাঁ, শুধু বটগাছেরই দাড়ি হয়।'

'অন্য গাছের দাড়ি হয় না?'

'না।'

'কেন?'

'তা তো জানি না!'

'কেন জানো না বাবা?'

'কেন জানি না?' বাবা এ কথাটারও জবাব দেন না। ছেলের হাত ধরে তিনি এগোতে থাকেন, নতুন নতুন গল্প বলতে থাকেন। ছেলে মুগ্ধ হয়ে সে গল্প শোনে আর নতুন নতুন প্রশ্ন করতে থাকে।

চাপাতির দ্বিতীয় কোপটি যখন তার হাতের তালুতে লাগে, তখন তার মনে পড়ে যায় স্কুলের কথা। তাদের স্কুলে এক আপা ছিলেন—সুরাইয়া আপা। আপা এত সুন্দর করে পড়াতেন, খুব আনন্দ লাগত তার। সবচেয়ে বেশি আনন্দ লাগত, যখন আপা ক্লাসের সবাইকে একটা করে চকলেট দিতেন।

আপা ক্লাসে এসে প্রতিদিনই কোনো না কোনো প্রশ্ন করতেন, 'বলো তো, আমাদের হাতের অনেকগুলো কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটা কাজ কী?'

ক্লাসের একজন বলল, 'হাত দিয়ে খাবার খাওয়া আপা।'

'হ্যাঁ, এটা একটা উল্লেখযোগ্য কাজ। কিন্তু আরেকটা কাজের কথা জানতে চাচ্ছি।'

ক্লাসে আরেকজন ছাত্র বলত, 'হাত দিয়ে কলম ধরা যায় আপা এবং সেই কলম দিয়ে লেখা যায় আপা।'

'হ্যাঁ, হাত দিয়ে লেখাও একটা উল্লেখযোগ্য কাজ। কিন্তু আমি এটাও জানতে চাচ্ছি না।'

'তাহলে?' পাশ থেকে আরেকজন ছাত্র আপাকেই প্রশ্নটা করে।

'তোমরা কেউ পারবে না বলতে?' আপা সবার দিকে গভীর আগ্রহ নিয়ে

তাকাল। কিন্তু মাথা নিচু করে ফেলল সবাই। কিছুক্ষণ আপা হাসতে হাসতে বলেন, 'হাতের একটা উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে—এ হাত দিয়ে মানুষের সেবা করা। তোমরা যখনই কোনো সুযোগ পাবে, মানুষের সেবা করবে। মনে থাকবে তো?'

সবাই চিৎকার করে বলত, 'জি, আপা।'

স্কুলে তাদের একটা স্যার ছিলেন—সোলেমান স্যার। স্যার ইংরেজি পড়াতেন। প্রতিদিন ক্লাসে আসার সময় স্যার একটা বেত নিয়ে আসতেন, কিন্তু কখনো সে বেত ব্যবহার করেননি তিনি।

স্যার একদিন ক্লাসে এসে সবাইকে শব্দার্থ জিজ্ঞাসা করলেন। সবাই ঠিক ঠিক সেসব শব্দের অর্থ বলে দিল। কেবল তার বেলাতেই স্যার একটি বানান জিজ্ঞাসা করলেন। স্যার খুব মিষ্টি করে হেসে বললেন, 'হাশেম, বলো তো, টু বানান কী?'

হাশেম মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, 'কোন টু স্যার?'

'টি-ও টু না, যে টু-এর মানে দুই, সেই টু-এর বানান বলো।'

হাসতে থাকে হাশেম। এত সহজ বানান কাউকে জিজ্ঞাসা করে কেউ! সে ঝটপট বলে ফেলে, 'টি-ও-ডব্লিউ টু স্যার।'

'আবার ভেবে দেখো, বানানটা ঠিক বলেছ কি না?'

'জি স্যার, আমি ঠিক বলেছি।'

'আবারও ভেবে দেখো।'

হাশেম এবারও কিছু না ভেবে বলে, 'জি স্যার, ঠিক বলেছি।'

স্যার হাশেমকে তার টেবিলের সামনে ডাকলেন। হাশেম বেশ সাহসী ভাব নিয়ে স্যারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। স্যার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এবার বলো তো দেখি, কোন বানানটা ঠিক— টি-ও-ডব্লিউ টু, না টি-ডব্লিউ-ও টু?'

আগের মতোই হাশেম বলল, 'টি-ও-ডব্লিউ টু।'

ক্লাসের প্রথম রোল নম্বরের ছাত্রের দিকে তাকালেন স্যার, 'তুমি বলো তো বানানটা।'

ছাত্রটি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'টিডব্লিউও টু।'

স্যার হাশেমের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী বুঝলে?'

হাশেম কোনো কথা বলে না। স্যার একটু পর বলেন, 'হাত পাতো।'

হাশেম প্রথমে কিছু বোঝে না। স্যার আবার বলেন, 'আমি তোমাকে হাত পাততে বলেছি।'

হাতটা পেতে দেয় হাশেম। স্যার এই প্রথম একটা ছাত্রের হাতে আঘাত

করলেন। ক্লাসের সবাই তাকিয়ে দেখল, হাশেমের চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। একটু পর তারা খেয়াল করল, স্যারের চোখ দিয়েও পানি পড়ছে।

স্কুলে ছুটি হওয়ার পর হাশেম বাড়ি যাচ্ছিল। হঠাৎ সে খেয়াল করে সোলেমান স্যার দৌড়ে আসছেন তার কাছে। একটু পর হাতটা ধরে নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলেন, 'খুব লেগেছে, না রে?' স্যার কথা বলছেন আর কাঁদছেন। কিছুক্ষণ পর স্যার বেশ অভিমানী গলায় বলেন, 'যাহ্, আর কোনো দিন ক্লাসে বেত নিয়ে যাব না।'

চাপাতির তৃতীয় কোপটা লাগল তার কনুইয়ের নিচের অংশে। সঙ্গে সঙ্গে তার মিনতির কথা মনে পড়ে গেল। মিনতিকে সে ভালোবাসত, মিনতিও তাকে ভালোবাসত। সুযোগ পেলেই মিনতিকে সঙ্গে নিয়ে হাশেম বেড়াত। হেঁটে বেড়ানো হোক কিংবা রিকশায় বেড়ানো হোক, মিনতি সব সময় হাশেমের হাতের নিচের অংশটুকু ধরে থাকত। এই হাতধরা নিয়ে হাশেম প্রায়ই হাসাহ-াসি করত। এতে মিনতি ভীষণ বিরক্ত হয়ে বলত, 'হাসছ কেন?'

হাশেম হাসতে হাসতেই বলত, 'এমনভাবে হাতটা ধরে রেখেছ, যেন হাত ছেড়ে দিলেই পালিয়ে যাব আমি।'

'হ্যাঁ, পালাতে তো তুমি পারই।'

'আমি পালাব!' কিছুটা আশ্চর্য হয়ে যায় হাশেম।

'কেন, পালাবে না তুমি?'

না, হাশেম পালায়নি। সে ঠিকই মিনতিকে জীবনসঙ্গী করেছে। বাসরঘরে হাত দিয়ে মিনতির ঘোমটা সরিয়ে হাশেম বলেছিল, 'তোমার কি এখনো সে ভয়টা আছে?'

'কোন ভয়টা?'

'আমি পালিয়ে যেতে পারি।'

মিনতি হাসতে হাসতে আগের মতোই স্বামীর হাতটা ধরে বলেছিল, 'হ্যাঁ, পুরুষমানুষকে বিশ্বাস নেই, সে যখন-তখন পালাতে পারে।'

হাশেম এখনো পালায়নি। তার চার-চারটি ছেলেমেয়ে হয়েছে, তাদের বিয়েও দিয়েছে সে।

চাপাতির চতুর্থ কোপটি প্রথম কোপটির মতো তার আঙুলে লাগল, এবার মনে পড়ে গেল তার ছেলেমেয়েদের কথা। তার বাবার মতো হাশেমও তার ছেলেমেয়েদের হাত ধরে বেড়াত, গল্প করত। তার ছেলেমেয়েরাও শিশির দেখে আনন্দ পেত, বটের ঝুরি দেখে লাফিয়ে উঠত।

চাপাতির পঞ্চম কোপটা লাগল তার বাহুতে, এবং এই প্রথম সে বুঝতে

পারল এ হাতটা সে চিরদিনের মতো হারাচ্ছে। তার মনে পড়ে গেল, প্রথম জীবনের কথা। প্রতিদিন প্রচণ্ড কষ্ট করে এই হাত দিয়ে কত ফসল ফলিয়েছে সে। ফসলের টাকা অল্প অল্প করে জমিয়ে আরো জমি কিনেছে, নতুন করে ঘর তুলেছে, স্ত্রীকে শাড়ি কিনে দিয়েছে।

হাশেম সিকদার এই শেষ জীবনেও প্রতিদিন তার কষ্টে গড়ে তোলা জমির কাছে যেতেন, জমির ফসলে হাত রাখতেন, স্বর্গীয় একটা সুখ অনুভব করতেন প্রতিমুহূর্তে।

এখন তার অনেক জমি হয়েছে। জমির প্রতিটি মাটির কণায় তার ঘাম, রক্ত, পরিশ্রম মিশে আছে। এই জমি নিয়েই বিরোধ বাধে পাশের গ্রামের এক জোতদারের সঙ্গে। তারপর হানাহানি। হাশেম সিকদার চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল সেই আগের মতোই, জমির পাশে। হঠাৎ একটা চাপাতির কোপ পড়ে তার হাতে, তারপর একে একে চারটি কোপ। পাঁচ নম্বর কোপটি পড়তেই হাশেম সিকদার দেখে, হাতটি তার দেহে নেই, সেটা পড়ে আছে একটু সামনে, তার জমির আলে। কত আপনজন এ হাতটা ধরেছে, কত প্রিয়জন এ হাতের স্পর্শ নিয়েছে, কারো কারো উষ্ণ সান্নিধ্যে উষ্ণ হয়েছে এ হাতটা!

হাশেম সিকদার সামনের দিকে তাকায়, তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া হাতটির দিকে তাকায়। তার হাতের আঙুলগুলো এখনো তিরতির করে কাঁপছে— হয়তো শেষবারের মতো প্রিয়জনের স্পর্শ পেতে চাইছে সে, কিংবা আঙুল নেড়ে বিদায় জানাচ্ছে সে, অথবা এত সব অমানবিকতা, ধ্বংস, নিষ্ঠুরতা আর হিংসার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী একটা আঙুল হওয়ার জন্য সোজা হওয়ার চেষ্টা করছে সে।

'তারপর?' হতবাক হয়ে গেছে ত্রিদিব।

'তারপর তো আর কিছু নেই।'

'পুলিশকে বলেননি কিছু?' মিমি খুব আন্তরিকভাবে কথাটা বলে।

'বলেছিলাম।'

'পুলিশ কিছু করেনি?' মিতু একটু ঝুঁকে আসে সামনের দিকে।

'পুলিশ প্রথমে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। শেষে পুলিশকে বিশ্বাস করানোর জন্য আমার কাটা হাতটি বাজারের ব্যাগে ভরে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।'

'আপনার এই যে একটা হাত নেই, কী মনে হচ্ছে আপনার?' রাশীক হাশেম সিকদারের আরেকটা হাত ধরে বলে, 'কেমন লাগছে এখন আপনার?'

হাশেম সিকদার হাসল। বরিশালের বাকেরগঞ্জ উপজেলার বিহারীপুর গ্রামের এই আশি বছরের বৃদ্ধের হাসি দেখে মনে হলো—জীবনটা এরকমই।

ছোট ছোট দুঃখ ছোট ছোট সুখের এক সমষ্টি। তাই তার হাসিতে কোনো কষ্ট নেই, নেই কোনো অভিযোগ।

হাশেম সিকদার হাসছে আর কাঁদছে। ঘোলাটে চোখের জলগুলো গড়িয়ে পড়ছে তার চৈত্রের ফাটা মাঠের মতো গাল বেয়ে। হঠাৎ এক ফোঁটা জল তার কাশফুলের মতো সাদা দাড়িতে গিয়ে লাগল, তারপর আরো কয়েকটা ফোঁটা। শেষে সেগুলো ঝরে পড়তে লাগল মাটিতে—যেন ঝরে পড়ছে মানুষের অসভ্যতা, নৃশংসতা আর বর্বরতা!

লঞ্চে উঠলেই ইদানীং হাসি পায় রাশীকের। লঞ্চে উঠেই প্রতি মুহূর্তে তার মনে হয়, এই বুঝি লঞ্চটা ডুবে গেল, সেও মারা গেল। তারপর তার ঠিকানা খুঁজে বের করে সরকারের পক্ষ থেকে বাসায় পৌঁছে দেওয়া হলো দুটো ছাগল।

ভাবনার এই জায়গাটায় এসে একটু শব্দ করে হাসে রাশীক। ছাগল দেখে কী ভাববে বাসার লোকজন, তারা ছাগল দুটো কী করবে, কোথায় রাখবে, তাদের তো ছাগল রাখার কোনো জায়গা নেই। আচ্ছা, লঞ্চ ডোবা মৃতের পরিবারের লোকজন আসলে কী করে? তারা কী ছাগলের চেহারায় তাদের মৃত স্বজনদের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়, না যারা ছাগলটা দিতে যায়, তাদের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়? মানুষ মারা যায় একজন, তার জন্য দুটো ছাগল কেন? ছাগল ছাড়া আর কোনো জিনিস নেই পৃথিবীতে? কার মাথা থেকে এ বুদ্ধিটা বের হয়েছে?

রাশীক হাসতে থাকে। তার এই হাসি দেখে মিমি নদী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাশীকের দিকে তাকিয়ে বলে, 'হাসছিস কেন?'

হাসতেই হাসতেই রাশীক বলে, 'ভালো করে আমার চেহারাটার দিকে তাকা তো।'

'কেন?' মিমি একটু শব্দ করে বলে।

'তাকাতে বললাম, তাকা।'

মিমি একটু এগিয়ে এসে রাশীকের চেহারার দিকে তাকাল। চাঁদ উঠেছে আকাশে। চাঁদের আলোয় চিক চিক করছে নদীর পানি, চিকচিক করছে চারপাশ, চিকচিক করছে রাশীকের মুখটাও। অদ্ভুত সুন্দর বাতাস বইছে। লঞ্চের এই ছাদে বাতাসটা আরো জোরে বইছে। মুখের সামনে নেমে আসা চুলগুলো সরাতে সরাতে মিমি বিরক্ত হয়ে বলল, 'কী যে বাতাস না!'

'কী দেখেছিস, আমার চেহারাটা?' রাশীক মিমির মাথায় ছোট্ট একটা চাটি মেরে বলল।

'হ্যাঁ, দেখলাম।'

'কিছু বুঝতে পারছিস?'

'কী?'

'আরো একটু ভালো করে দেখ।'

মিমি আগের মতো রাশীকের দিকে তাকাল, 'হ্যাঁ। আরেকবার ভালো করে দেখলাম।'

'এবার কিছু বুঝতে পারছিস?'

'না।'

'কিছুই বুঝিসনি!'

'বললাম তো, না।'

'আবার দেখ।'

'না, দেখতে হবে না।' মিমি রাশীকের এগিয়ে দেওয়া মাথাটা হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'বল, কী হয়েছে?'

'আচ্ছা, আমার চেহারাটা কি ছাগলের মতো লাগছে?'

মিমি রাশীকের পিঠে একটা থাপ্পড় মেরে বলে, 'এসব কী বলছিস তুই!'

'কেন, লাগছে না?'

'না।'

'অথচ জানিস, লঞ্চে উঠলেই আমার কেন যেন মনে হয়, আমি নিজে একটা ছাগল। ঠিক কেন মনে হয়, তা জানি না, তবে মনে হয়। আচ্ছা, তোদের মনে হয় না?'

'না।'

'কিন্তু আমার মনে হয়।' ত্রিদিব লঞ্চের পাশ থেকে হেঁটে আসতে আসতে বলল, 'আমার কিন্তু কেবল লঞ্চে উঠলেই মনে হয় না, সব সময় মনে হয়।'

মিতু অনেকক্ষণ হলো চুপ হয়ে বসে আছে। ও পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছে নদীর দিকে। লঞ্চের টানা শব্দের মধ্যেও কোথায় যেন অন্য রকম একটা শব্দ হচ্ছে। মিতু সেটাই শুনছে।

রাশীক মিতুর পাশে এসে বসে, 'কিরে, একদম চুপচাপ হয়ে বসে আছিস যে!'

'ভালো লাগছে না।' বিষণ্ন ভেজা কণ্ঠ মিতুর।

'কেন?'

'জানি না।'

মিতুর মাথার কয়েকটা চুল টেনে ধরে রাশীক বলে, 'মামীর কথা মনে

পড়ছে, না?'

কিছু বলে না মিতু।

'মামাকে ছেড়ে যাওয়ার পর মামী তো এখন বরিশালেই থাকেন, না?'

'হ্যাঁ, মা বরিশালে একটা এনজিওতে জয়েন করেছে।'

'মামা জানেন এটা?'

'জানে।'

'মামী ঢাকায় আসেন না?'

'মাসে দুবার অফিসের কাজে মাকে ঢাকায় আসতে হয়।'

'তাহলে তো মামী এ রকম কোনো লঞ্চেই যাতায়াত করেন।'

'হ্যাঁ।'

'অ, এই জন্য তোর মন খারাপ?'

সোজা হয়ে বসল মিতু। উড়তে থাকা মাথার চুলগুলো টেনে বেঁধে বলল, 'মাকে কত দিন দেখি না, জানিস?'

'কত দিন?'

'প্রায় সাত বছর।' মাথাটা নিচু করে মিতু বলল, 'এখন শুধু মাঝে মাঝে কথা হয়। আমার মনে হচ্ছে, একদিন আমাদের কথাও হবে না।' মিতু রাশীকের দিকে তাকিয়ে সোজা হয়ে বসে বলল, 'এখন কোন ঋতু, জানিস?'

'না তো!'

'শরৎ।'

'হঠাৎ ঋতুর কথা জিজ্ঞাসা করলি কেন?'

'না, এমনি।'

'এমনি তো নয়ই, নিশ্চয় কোনো কারণ আছে।' রাশীক মিতুর দিকে একটু ঝুঁকে আসে।

মিতুটা কিছুটা থেমে বলে, 'শরৎকাল মার খুব পছন্দ।'

'তাই?'

'একটা জিনিস খেয়াল করেছিস–দিনের বেলা নদীর পানিকে যতটা অশান্ত মনে হয়, রাতের বেলা মনে হয় একেবারেই শান্ত। কেন?'

'তা তো জানি না!'

'পানিরা বোধহয় ঘুমায় কিংবা সারা দিন মানুষের নীচুতা, পশুত্ব, অমানবিকতা দেখে লজ্জায় চুপ হয়ে যায় রাতে। তারপর তারা প্রার্থনা করে স্রষ্টার কাছে–প্রভু, এ রাতটা শেষ কোরো না, আলো জ্বালিয়েও না, বরং আরো অন্ধকার করে দাও চারদিক।'

সদরঘাটে ওরা যখন লঞ্চ থেকে নামল, তখন সকাল সাড়ে আটটা। লঞ্চের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মিমি বলল, 'সামনের কোনো হোটেলে ভাত খাব আমি।'

মিতু কিছুটা নাক সিটকিয়ে বলল, 'এখানে ভাত খাবি তুই!'

'হ্যাঁ, এখানে সকালবেলা অনেক তাজা মাছের তরকারি পাওয়া যায়।'

'মাছগুলো কোথা থেকে আসে, জানিস?'

'না।'

'এই যে বুড়িগঙ্গা নদী দেখছিস, এখান থেকে।'

'তাতে অসুবিধা কী?'

'এই নদীতে কী কী ভাসে, তুই জানিস?'

'তুই যে প্রতিদিন বাসায় মাছ খাস, তা কোথা থেকে আসে, জানিস?'

'আমরা সবাই জানি।' ত্রিদিব একটু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলি, 'আমরা জানি, আমরা প্রতিদিন ভেজাল খাই, ভেজাল গ্রহণ করি। আমরা ভেজাল খাই, ভেজাল নিঃশ্বাস নিই, ভেজাল কাজ করি, ভেজাল চিন্তা করি, ভেজাল কথা বলি, আমরা ভেজাল মানুষদের ভোট দিই, আমরা ভেজাল মানুষদের আমাদের নেতা বানাই, সবশেষে আমরা নিজেরাই একেকজন ভেজাল মানুষে পরিণত হই।'

'তারপর?' মিমি হাসতে হাসতে বলল।

ত্রিদিবও হাসতে হাসতে বলল, 'তারপর এ রকম ভেজালে-মানুষের সমষ্টিতে আমরা একটা ভেজাল জাতির জন্ম দিই।'

'এভাবে আর কত দিন, বল তো ত্রিদিব?' কান্না কান্না স্বরে কথাটা বলে মিতু ত্রিদিবের দিকে তাকায়।

ত্রিদিব কিছু বলার আগেই রাশীক বলে, 'হয়তো আর মাত্র কটা দিন, আরো কয়েক বছর, আরো কয়েক যুগ। কিংবা কোনো কালেই নয়।'

সদরঘাট থেকে চারজন হেঁটে এসেছে। রাশীক আর মিমি যাবে ধানমন্ডিতে, মিতু যাবে মণিপুরিপাড়ায়, আর ত্রিদিব যাবে উত্তরায়। তৃপ্তিভরে হোটেল থেকে খেয়ে মিমি বলেছিল, 'চল, আজ হেঁটে হেঁটে বাসায় যাই।'

ত্রিদিব সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল, 'আমার আপত্তি নেই, আমি তো সারা দিন হেঁটেই চলাফেরা করি।'

হাঁটতে হাঁটতে ওরা যখন বাংলামোটর এলো, ঠিক তখনই দেখতে পেল, রাস্তা বন্ধ। গাড়ি-টাড়ি চলছে না। সমস্ত রাস্তা ফাঁকা। ত্রিদিব একটু এগিয়ে গিয়ে একজন পুলিশ সার্জেন্টকে বলল, 'ব্যাপার কী ভাইজান?'

খুব ব্যস্ততার ভান করে সার্জেন্ট বললেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যাবেন।'

'প্রধানমন্ত্রী যাবেন, তাতে রাস্তা বন্ধ কেন?'

সার্জেন্ট এ কথার জবাব দিলেন না। রাশীক একটু এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করতেই ত্রিদিব বলল, 'কোনো কোনো নেত্রী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে ঘোষণা দেন, তিনি যখন রাস্তায় বের হবেন তখন রাস্তা বন্ধ থাকবে না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তিনি রাস্তায় বের হন এবং আগের মতোই রাস্তা বন্ধ থাকে। তিনি একদিন ক্ষমতা থেকে চলে যান, আরেক প্রধানমন্ত্রী আসেন। তিনিও রাস্তায় বের হন এবং যথারীতি রাস্তা বন্ধ থাকে। আর সাধারণ জনগণ তাদের সগৌরবে রাস্তা দিয়ে চলে যাওয়া দেখার জন্য মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে। এর কোনো মানে হয় না।'

'অথচ পৃথিবীর কোনো সভ্য দেশে এ রকম নেই।' মিমি ত্রিদিবের সামনে এসে বলল, 'এর একটা পরিবর্তন দরকার।'

'শুধু এর পরিবর্তন দরকার!' ম্লান হেসে ত্রিদিব একবার আকাশের দিকে তাকায়, তারপর দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, 'এ দেশের সবকিছুরই পরিবর্তন দরকার, আমূল পরিবর্তন।'

কার যেন চিৎকার শোনা যায় রাস্তার ওপাশ থেকে। ওরা চারজন দ্রুত সেখানে গিয়ে দেখে, একটা স্কুটারে বসে একজন মহিলা চিৎকার করছেন। তার পাশে একজন ভদ্রলোক বসা। রাশীক কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

ভদ্রলোক কিছুটা বিব্রত হয়ে বলল, 'বাচ্চা হবে তো, রাস্তার ওপাশে হাস-পাতাল, দ্রুত যাওয়াটা জরুরি, কিন্তু...।'

'কিন্তু কী, যেতে দিচ্ছে না?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'প্রধানমন্ত্রী নাকি যাবেন।'

বুকের ভেতর প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে উঠল রাশীকের। সমস্ত মুখ লাল হয়ে গেছে ওর। এ মুহূর্তে কী করা দরকার বুঝতে পারছে না সে। কানের কাছে দীর্ঘশ্বাসের শব্দ পেতেই ফিরে তাকাল ও। ত্রিদিব, মিমি, মিতু দাঁড়িয়ে আছে। অসহায়ের মতো চারপাশে তাকাল ওরা।

হঠাৎ রাস্তার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে রাশীক বলল, 'ভাইসব, একটা চিৎকার শুনতে পাচ্ছেন আপনারা?'

চারপাশের সমস্ত মানুষ যেন কান পাতল এবং একটু পর তারা শুনতে

পেল—পাশের একটা স্কুটারে বসে একজন মহিলা চিৎকার করে কাঁদছেন। পাঁচ-ছয়জন এগিয়েও গেল স্কুটারের কাছে।

রাশীক আবার চিৎকার করে বলল, 'আপনারা যে ভদ্রমহিলার চিৎকার শুনছেন, একটু পর তার বাচ্চা হবে, তিনি প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করছেন। তাকে রাস্তায় ওপাশে যেতে হবে, ওপাশে হাসপাতাল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর দোহাই দিয়ে তাকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। এবার আপনারা বলুন, কোনটা বেশি জরুরি—প্রধানমন্ত্রীর জন্য রাস্তা বন্ধ করা, না এই ভদ্রমহিলাকে রাস্তা পার করে ওপাশে যেতে দেওয়া?'

রাশীক অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে রইল সামনের দিকে। পাশে ত্রিদিব, মিমি, মিতুও দাঁড়িয়ে আছে। অনেকগুলো মানুষ জড়ো হয়ে গেছে স্কুটারের পাশে। হঠাৎ একজন বুড়োমানুষ একটা গাড়ি থেকে নামলেন। কাঠের একটা লাঠি হাতে তিনি রাশীকের দিকে এগিয়ে এলেন। ওদের পাশে দাঁড়িয়ে চারপাশটা একবার দেখে নিলেন। তারপর কিছুটা বজ্রকণ্ঠে বললেন, 'প্রধানমন্ত্রীর রাস্তা বন্ধ, আগে আমার এ মা জননী যাবে।'

মাত্র কয়েক সেকেন্ড। কয়েক শ মানুষ রাস্তায় নেমে এলো, দুপাশের রাস্তা বন্ধ করে তারা দাঁড়িয়ে রইল। মাঝখান দিয়ে স্কুটারটা চলে গেল। মহিলা তখনো চিৎকার করছেন। তিনি হয়তো কিছু বলতে চাইলে, কিন্তু বলতে পারলেন না। কারণ মাতৃজঠরের ভেতর থেকে কেউ একজন পৃথিবীর আলো দেখার জন্য চিৎকার করছে, তীব্র চিৎকার!

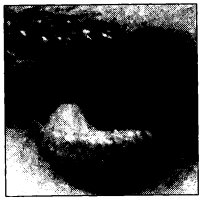

তেত্রিশ বছর ধরে একটা কাজ করতে কখনো ভোলেন না রফিকুল বারী খান। ঘুম থেকে উঠেই তিনি সোজা চলে যান তার ঘরের পুব পাশের জানালায়। আগে হাতটা বাড়িয়ে হাতাতে হাতাতে জানালার ছিটকিনিটা খুলতেন, এখন সরাসরি সেখানে হাত দিয়ে খুলে ফেলেন সেটা। এতগুলো বছরে জায়গাটা মুখস্থ হয়ে গেছে তার।

জানালা খুলে প্রথমেই তিনি যে কাজটা করেন—বুকভরে নিঃশ্বাস নেন তিনি। প্রকৃতির অদ্ভুত মিষ্টি একটা গন্ধ আছে। সেটা নিতে নিতে তিনি টের পান—অপার্থিব এক আলো এসে থমকে আছে তার চোখে-মুখে।

মাঝে মাঝে এই আলোটা তিনি হাত দিয়ে ধরতে চান। যদিও তিনি জানেন, আলো কখনো স্পর্শ করা যায় না, তবুও ধরতে চান। ভোরের প্রথম আলো তাকে প্রতিদিন উজ্জীবিত করে, নতুন করে জাগিয়ে দেয়, নতুন পথের দিক দেখায়।

বাবা প্রতিদিন এই সময়টাতে তার পাশে এসে দাঁড়ান। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে তিনি অনেকক্ষণ তার এই ছেলেটাকে দেখেন। তারপর একসময় খুব কাছে গিয়ে পিঠে হাত দিয়ে বলেন, 'বাবা রফিক, আমাকে ক্ষমা করেছিস তো?'

কথাটা শুনে প্রতিদিন মন খারাপ হয়ে যায় রফিকের। তবুও তিনি হাসতে হাসতে বলেন, 'প্রতিদিন এ কথাটা বলে আমাকে লজ্জা দেন কেন বাবা?'

'তোকে তো আমি লজ্জা দিই না বাবা।' বাবা ছেলের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলেন, 'আমি যে সেই তেত্রিশ বছর ধরে লজ্জিত হয়ে আছি।'

'আপনি অযথা লজ্জা করছেন বাবা।' রফিক হাত বাড়িয়ে বাবার একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে বলেন, 'আপনার তো কোনো দোষ ছিল না।'

'ছিল।' বাবার সাতষট্টি বছরের চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পানি ঝরে। বাবা সেভাবেই কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'যদি একটু সচেতন হতাম, তাহলে তোর চোখ দুটো এভাবে হারাতে হতো না।'

'সেটা তো ডাক্তারদের ভুল চিকিৎসা ছিল বাবা।'

'হ্যাঁ, তার সঙ্গে আমাদের অসচেতনতাও ছিল। যদি তখন আরো একটু ভালো ডাক্তার দেখাতাম, আরো একটু যত্ন নিতাম, তাহলে তুই আজ দেখতে পেতিস।'

'বাবা, আপনি এমনি এমনি কষ্ট পাচ্ছেন।'

'কষ্ট কি এমনি পাই! দুই বছর বয়স থেকে তুই কিছু দেখতে পাস না, অথচ আমি এখনো দেখতে পাই। বাবা হিসেবে এটা আমার কাছে যে কত অসহনীয়!' বাবা আবদুর রহিম খান আবার কাঁদতে থাকেন।

রফিকুল বারী খানের দিন শুরু হয় এভাবেই।

রফিকুল বারীর জানালার পাশে একটা রাস্তা আছে। প্রতিদিন সে রাস্তা দিয়ে অনেক মানুষ হেঁটে যায়। তিনি একদিন জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। সে প্রায় সতের-আঠার বছর আগের কথা। হঠাৎ একটা মেয়ে রাস্তার পাশ থেকে তার জানালার কাছে এসে বলে, 'আপনি তো দেখতে পান না, তবুও প্রতিদিন এই জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আপনি তাকিয়ে থাকেন। কী দেখেন আপনি?'

'আপনাদের দেখি, প্রজাপতি দেখি, পাখি দেখি।'

'আপনি তো দেখতে পান না, তাহলে...।'

'আমি দেখতে না পেলে কী হবে। প্রজাপতির উড়ে যাওয়ার শব্দ শুনলেই আমার প্রজাপতি দেখা হয়ে যায়, পাখির কিচিরমিচির শুনলেই আমার পাখি দেখা হয়ে যায়। আর আপনারা সবাই মিলে গল্প করতে করতে যখন স্কুলে যান, তখন আপনাদের দেখা হয়ে যায় আমার।'

মেয়েটি এবার হাসতে হাসতে বলে, 'বলুন তো, আমি দেখতে কেমন?'

রফিকুল বারী কিছুক্ষণ চুপ হয়ে থাকেন। তারপর ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলেন, 'যদি আপনার মুখটা স্পর্শ করতে পারতাম, তাহলে বলে দিতে পারতাম, আপনি দেখতে কেমন। তবুও বলছি, হাসলে আপনার গালে টোল পড়ে, না?'

'অ আল্লাহ, এটা কী করে জানলেন!'

'কী করে জানলাম? যে মেয়েদের হাসি নূপুরের শব্দের মতো, তাদের গালে সাধারণত টোল দেখা যায়। যদিও আপনি এ মুহূর্তে পায়ে নূপুর পরে আছেন।'

'আমি যে পায়ে নূপুর পরে আছি, এটা জানলেন কী করে?'

'খুবই সহজ। আপনি কথা বলছেন আর পা নাচাচ্ছেন, ফলে নূপুরের মৃদু মৃদু শব্দ হচ্ছে।' রফিকুল বারী একটু চুপ থেকে বলেন, 'আপনি তো চুলে বেণি করেছেন, না?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি জিজ্ঞাসা করলেন না, এটাও আমি জানলাম কী করে?'

'কীভাবে জানলেন?'

'গালে টোল পড়া মেয়েরা চুলে বেণি করতে পছন্দ করে।'

'টোল পড়া কোনো মেয়েকে আপনি কখনো দেখেছেন?'

'না। এই প্রথম কোনো টোল পড়া মেয়ের সঙ্গে কথা হলো আমার। আমার কিছু বন্ধু আছে, ওরা বিভিন্ন গল্প করে তো, মাঝেমধ্যে টোল পড়া মেয়েদের গল্পও করে। সেখান থেকে আমি ধারণা নিয়েছি। আচ্ছা, আপনার গালের টোল পড়া দেখে কেউ কিছু বলেনি?'

'বলেছে।'

'কী বলেছে?'

'অনেক কিছু।' মেয়েটি একটু থেমে বলে, 'তার চেয়ে বেশি ছুঁতে চেয়েছে।'

'ছুঁতে চেয়েছে!'

'অবাক হচ্ছেন কেন? কারো কিছু ছুঁতে ইচ্ছে করলে সেটা ছুঁতে চাইবে না?'

'একটা কথা বলি?'

'বলুন।'

'কিছু মনে করবেন না তো?'

'কিছু মনে করার হলেও মনে করব না। আপনি বলুন।'

রফিকুল বারী কিছুক্ষণ চুপ থেকে বেশ ইতস্তত ভঙ্গি নিয়ে বলেন, 'আপনার টোল কেউ কখনো ছোঁয়নি?'

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে মেয়েটি বলে, 'না। তবে আমি চাই কেউ একজন আমার গালের টোল স্পর্শ করুক।'

মেয়েটির সঙ্গে তার পর থেকে প্রায় প্রতিদিনই কথা হয় রফিকুল বারীর। কোনো কোনো দিন মেয়েটি তাকে নিয়ে বেড়াতে যেতে চায়। কখনো কবিতা আবৃত্তি করে শোনায়, কখনো মজার মজার গল্প করে। একদিন মেয়েটি হাসতে হাসতে বলে, 'জানেন, আজ আমাকে একজন কী বলেছেন?'

'কী বলেছেন?'

'আন্দাজ করুন তো।'

'তার আগে বলুন, লোকটার বয়স কত?'

'এই ধরুন পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন।'

'তুমি দেখতে ঠিক আমার মেয়ের মতো—এটা বলেছে, না?'

মেয়েটি শব্দ করে হেসে ওঠে, 'না, তিনি বলেছেন—তুমি কি আমাকে বিয়ে

করবে?'

'যাহ্, এটা বলেছে নাকি?'

'আপনার সন্দেহ হচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'হায়! আপনি যদি জানতেন—একটা মেয়ে ঘর থেকে বের হলে প্রতিদিন কত ধরনের কথা শুনতে হয় তার, আপনি বিশ্বাসই করতে পারবেন না। কী বিচিত্র সে কথাগুলো! যদি সে কথাগুলো লিখে রাখা যেত, তাহলে ডিকশনারির মতো মোটা মোটা কয়েকটা বই হয়ে যেত।'

'স্যরি, এ বিষয়ে আমার কোনো ধারণা নেই।'

তারপর হঠাৎ উধাও হয়ে যায় মেয়েটা। বেশ কয়েক দিন পর হঠাৎ একদিন এসে খুব দুঃখী দুঃখী গলায় বলে, 'আজ একটা অনুরোধ করব আপনাকে।'

রফিকুল বারী দ্বিধা নিয়ে বলেন, 'কী?'

'আপনি কি আমার গালের টোলটা স্পর্শ করবেন আজ?'

রফিকুল বারী মেয়েটির সে অনুরোধ রাখেননি। মেয়েটিও আর কোনো দিন তার কাছে আসেনি। দীর্ঘ পনের-ষোল বছর পর তিন দিন আগে একটা মেয়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়ায়। তারপর খুব নরম গলায় বলে, 'কেমন আছেন?'

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে রফিকুল বারী বলেন, 'এত দিন পর এলেন!'

'আপনি অপেক্ষায় ছিলেন?'

'না।'

'তাহলে?'

'একটা মানুষ কেন হঠাৎ উধাও হয়ে গেল, সে উৎকণ্ঠায় ছিলাম।' রফিকুল বারী কী যেন ভাবেন একটু, তারপর বলেন, 'আপনার বাচ্চা দুটো খুব সুন্দর হয়েছে, না?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার মেয়েটার গালেও তো টোল পড়ে, না?'

'হ্যাঁ।'

'একদিন আপনার মেয়েটাকে একটু নিয়ে আসবেন। বাবা যেমন মেয়েকে স্পর্শ করে, আমিও তেমন ওর গালের টোলটা একটু স্পর্শ করব।'

রফিকুল বারী কোনো কোনো সকালে এতটাই মুগ্ধ হয়ে যান যে, প্রচণ্ড রকম জল এসে যায় তার চোখে। তিনি সেই জলভরা চোখ নিয়ে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকেন জানালার দিকে। আর কান পেতে শুনতে থাকেন সব ধরনের শব্দ। সেসব শব্দের একটা শব্দ তাকে প্রায় পাগল করে তোলে—সে হলো

দোয়েলের শব্দ। দোয়েলপাখি শিস বাজায়, তার মনে হয় কে যেন গান গায়, বহুদূর থেকে কে যেন বাঁশি বাজায়।

বাবার মতো মাও কোনো কোনো দিন খুব নিঃশব্দে পাশে এসে দাঁড়ান। পিঠে হাত দিয়ে অনেকক্ষণ বোলাতে থাকেন হাতটা। তারপর একসময় ভেজা ভেজা কণ্ঠে বলেন, 'দোয়েলপাখি দেখতে কেমন, জানিস খোকা?'

'ছোট্ট একটা পাখি, কিন্তু লেজটা খুব লম্বা।'

'প্রথমটুকু ঠিক হয়েছে, কিন্তু পরেরটুকু ঠিক হয়নি।'

'দোয়েলপাখির লেজ কি ছোট?'

'ছোটও না, বড়ও না। স্বাভাবিক।'

'আচ্ছা, আকাশ দেখতে কেমন?'

'আকাশ হচ্ছে কিছুটা তুলোর মতো।'

'তুলো দেখতে কেমন?'

'তুলো দেখতে কেমন?' মা কিছুটা আমতা আমতা করে বলেন, 'তুলো দেখতে তো তুলোর মতোই।'

'সেটা তো তুমি জানো, কিন্তু আমি তো জানি না।'

মা কিছুটা অপরাধী মুখে বলেন, 'আকাশটা হচ্ছে বিশাল একটা জায়গা। সেখানে অনেক রকমের মেঘ ভেসে বেড়ায়, অনেক রঙের মেঘ ভেসে বেড়ায়।'

'এর মধ্যে কোন রঙের মেঘ দেখতে সবচেয়ে বেশি সুন্দর?'

'নীল রঙের মেঘ।'

'মা, অনেকে বলে সন্ধ্যায় আকাশ দেখতে নাকি অদ্ভুত?'

'হ্যাঁ, অদ্ভুত, খুব অদ্ভুত। লালচে রঙের আকাশের সাথে লাল রঙের গোল সূর্য।'

'সূর্য কি গোল মা?'

'হ্যাঁ গোল।' মা রফিকের মাথায় চুলগুলো নাড়তে নাড়তে বলেন, 'তোকে একদিন সমুদ্রে নিয়ে যাব।'

'কেন?'

'সমুদ্র হচ্ছে দেখার জিনিস। সমুদ্র দেখলে মানুষের মন বড় হয়।'

রফিক হাসতে হাসতে বলেন, 'আমার তাহলে কী হবে মা?'

'তুই সমুদ্র দেখবি না, সমুদ্র তোকে দেখবে।'

'সমুদ্র আমাকে দেখে কী করবে?'

'মানুষও যে সমুদ্র হতে পারে, এ জিনিসটা সে জেনে যাবে।'

মায়ের এ কথা শুনতে শুনতে রফিকের সত্যি সত্যি সমুদ্র হতে ইচ্ছে করে!

সমুদ্রের বুকে কত জল, সমুদ্র কত কিছু ধারণ করে তার বুকে!

তারপর?

তারপর সমুদ্র হওয়ার চেষ্টায় রফিক দুঃসাহসী এক কাজ হাতে নেন। সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীনে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ শেষ করে একটা কটন মিলে যোগ দেন তিনি। চাকরি শেষে তিনি যে টাকাগুলো পান, সবটুকু দিয়ে প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি স্কুল স্থাপন করেন—স্কুলের নাম ঘাটাইল প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়।

'আপনি কি জানেন, আপনি সমুদ্র হতে পারবেন?' ত্রিদিব রফিকুল বারীর সমুদ্র হওয়ার কথা শুনতে শুনতে একটা হাত চেপে ধরে তার।

মিষ্টি হেসে রফিকুল বারী বলেন, 'কী জানি!'

'আপনি সমুদ্র হতে পারবেন।' ত্রিদিব আবার বলে।

'আপনি হঠাৎ এই স্কুল করার কথা ভাবলেন কেন?' মিমি রফিকুল বারীর দিকে তাকিয়ে বলে।

'সুযোগ পেলে প্রতিবন্ধীরাও যে অনেক কিছু করতে পারে, এ জিনিসটা আমি প্রমাণ করে দিতে চাই।'

'এ ব্যাপারে আপনি কতটুকু আত্মবিশ্বাসী?' মিতু খুব বিশ্বাসী হয়ে বলে।

'কোনো কিছুতেই আমার অবিশ্বাস নেই। আমার সমস্ত বিশ্বাস আমি জমা রেখেছি এ কাজটার জন্য।'

'আপনি কি স্বপ্ন দেখেন?' রাশীক রফিকুল বারীর কাঁধে একটা হাত রাখে।

'প্রতি মুহূর্তে আমি স্বপ্ন দেখি। অনেকে ভাবে, চোখ না থাকলে নাকি স্বপ্ন দেখা যায় না। কিন্তু তারা জানে না, স্বপ্ন দেখতে চোখ লাগে না, একটা মন লাগে। আমার এটাও বিশ্বাস—সে রকম একটা মন আমার আছে!'

'অভিনন্দন আপনাকে।'

'আপনাদের ধন্যবাদ।' রফিকুল বারী একটু থেমে বলেন, 'প্রতিদিন আমি আমার জানালার পাশে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে বলি—আমাকে আরো একটু সাহস দাও, আরো একটু স্বপ্ন দেখার সাধ দাও। কারণ সাহসীরা সব পারে!'

কথাটা শুনে চমকে ওঠার কথা, কিন্তু একটুও চমকে উঠল না রাশীক। সে খুব স্বাভাবিকভাবে সামনে দাঁড়ানো পুলিশ ইন্সপেক্টরকে বলল, 'আমার অপরাধ?'

'গতকাল আপনি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিলেন।'

'বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিলাম!' বেশ অবাক হয়ে রাশীক বলল, 'কোথায়?'

'রাস্তায়।'

'কোন রাস্তায়?

'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যাবেন বলে রাস্তা ক্লিয়ার করা হয়েছিল, কিন্তু বাংলামোটরের মোড়ে একটা গ্যানজাম সৃষ্টি করেছিলেন আপনি।'

'আপনারা কি জানেন, কেন সেটা করা হয়েছিল?

'কিছুটা জানি।'

'এবার আপনাকে একটা প্রশ্ন করি।' রাশীক কিছুটা উত্তেজিত হয়ে বলল, 'আপনার স্ত্রীর বাচ্চা হবে, প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করছেন তিনি, এখনই তাকে হাসপাতালে নেওয়া দরকার। কিন্তু রাস্তা বন্ধ থাকায় যেতে পারছেন না আপনি।' পুলিশ ইন্সপেক্টরের চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে রাশীক বলল, 'কী করতেন তখন আপনি?'

'কিছুই করতাম না, কারণ রাস্তা দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যাবেন তখন।'

প্রচণ্ড রাগী চোখে তাকাল রাশীক, 'দাসত্ব করতে করতে আমাদের সবার মেরুদণ্ড একেবারে বাঁকা হয়ে গেছে। দুইশ বছর ব্রিটিশের গোলামি, পঁচিশ বছর পাকিস্তানের গোলামি, আর এখন তাদের প্রেতাত্মাদের গোলামি করতে করতে আমরা এখন পুরোপুরি দাস হয়ে গেছি। আমরা এখন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারি না, চোখ উঁচু করে তাকাতে পারি না, মুখফুটে কথাও বলতে পারি না।'

'আপনার কথা হয়তো সত্য, কিন্তু কিছুই করার নেই আমাদের।'

'কে বলল নেই! আপনারা কখনো প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছেন?'

'আমাদের কাজ তো সেটা না।'

'আপনাদের তাহলে কী কাজ? রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে ছিনতাইকারীদের সহযোগিতা করা, কেউ বিপদে পড়লে তার কাছ থেকে ঘুষ খাওয়া, না নিরপরাধ মানুষদের ধরে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে ঠ্যাং-হাত-পা ভেঙে দেওয়া?'

'আপনি রেগে যাচ্ছেন?'

'আজ আমি রাগছি, আর কিছুদিন পর সবাই রাগবে। আপনি দেখবেন, একদিন এ দেশের সাধারণ মানুষ প্রতিটা অসৎ মানুষকে গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে পেটাবে, তাদের আগুনে পোড়াবে, তাদের হাত-পা কেটে টুকরো টুকরো করে বস্তায় ভরে নদীতে ভাসিয়ে দেবে।'

'হয়তো।'

'হয়তো কী, আপনার বিশ্বাস হয় না? আমাদের মানুষ কী করেনি—আমরা ব্রিটিশদের তাড়িয়েছি, পাকিস্তানিদের তাড়িয়েছি, প্রতি পাঁচ বছর পর একটা করে স্বৈরশাসক আসে, তাদেরও তাড়াই। আমরা সব করি। দেখবেন, আমরা একদিন এ দেশের সব অন্যায় দূর করে ফেলব।'

'কে রে, কে এসেছে?' সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে ড্রইংরুমে ঢুকতে ঢুকতে দাদু কথাটা বলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাশীক এগিয়ে যায়। দাদুর হাতটা ধরে বলে, 'তুমি এলে কেন দাদু?'

'কে নাকি এসেছে?'

'না, কেউ আসেনি।'

'তুই তো আমার কাছে মিথ্যা বলিস না দাদু।'

রাশীক কিছুটা ইতস্তত করে বলে, 'পুলিশ এসেছে।'

'পুলিশ! কেন?'

'আমাকে নিয়ে যেতে এসেছে।'

'তোকে নিয়ে যাবে কেন?'

'তা তো জানি না।'

'তোর বাবা জানে?'

'না, তবে জেনে যাবে। এত বড় একজন ক্ষমতাবান রাজনীতিবিদের কাউকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে, সেটা সবাই জেনে যাবে। এমনকি দেখো, পত্রিকায় ছবিও ছাপা হয়ে যেতে পারে।'

'এসব তুই কী বলছিস!'

'সত্যি কথা বলছি দাদু, একেবারে সত্যি কথা।'

'এই যে, কে এসেছেন?' দাদু সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে পুলিশ

ইন্সপেক্টরকে ডাকতে থাকেন। এগিয়ে আসেন তিনি। তারপর দাদুর সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, 'আপনি চিন্তা করবেন না, আমরা শুধু ওনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

'কেন?

'সেটা নাহয় পরে শুনবেন।'

'আপনারা ওকে নিয়ে গিয়ে মারবেন না তো?'

'না, মারব কেন?'

দাদু হঠাৎ রাশীককে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ওঠেন। একটু পর রাশীকের চোখেও জল চলে আসে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। কেমন শান্ত হয়ে এসেছে চারদিক। বারান্দার হাসনাহেনা গাছের ফুল থেকে সুবাস আসছে। হঠাৎ রাশীকের মোবাইলটা বেজে ওঠে। রিসিভ বাটন টিপেই ও বলে, 'হ্যালো।'

ওপাশ থেকে চমৎকার এক মেয়েকণ্ঠ বলে, 'হ্যালো।'

'কে?'

'চিনতে পারছ না?'

'না তো!'

'গলার স্বরটাও চেনা যায় না?'

রাশীক একটু ভেবে বলে, 'না।'

'না চেনারই কথা।'

'কে বলছেন?' রাশীক কিছুটা উত্তেজিত হয়ে বলে।

'কে বলছেন না বলে বলো—কে বলছ।'

'আপনি কে?'

'আমি কে?' মেয়েকণ্ঠটা হাসতে হাসতে বলে, 'আমাদের মাঝে একটা সম্পর্ক ছিল।'

'সম্পর্ক!'

'হ্যাঁ, যদিও সে সম্পর্কটার কোনো নাম ছিল না। অন্তত তোমার কাছে ছিল না।'

'আপনি কে বলছেন?' এবার কিছুটা বিরক্ত হয়ে বলে রাশীক।

'সম্পর্কের ব্যাপারে আমি বলেছিলাম—আমাদের সম্পর্কহীন সম্পর্কটাই ভালো। শুনে তুমি বলেছিলে, তোমার কি কোনো সম্পর্ক দরকার? আমার সেদিন অনেক কিছু বলতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু পারিনি। আচ্ছা, তোমার ঘরে কি সেই ফাঁসির দড়িটা এখনো আছে?'

'না'।

'কোনো সুখী মানুষ খুঁজে পাওনি, না?'

'হ্যাঁ।'

'পাবে না। পৃথিবীতে সুখী মানুষ বলে আসলে কেউ নেই। আচ্ছা, তুমি কি আমাকে সত্যি সত্যি ভুলে গেছ?'

রাশীকের চোখ দুটো হঠাৎ চকচক করে ওঠে। চোখের মণি দুটোও চঞ্চল হয়ে ওঠে তার। একটু পর দ্রুত একটা নিঃশ্বাস নিয়ে সে বলে, 'তুমি— ।'

কথাটা শেষ করতে পারল না রাশীক। তার আগেই ওপাশ থেকে কেটে গেল টেলিফোনটা।

খুব আস্তে আস্তে মোবাইলটা পকেটে ঢুকিয়ে রাশীক একটু সামনের দিকে তাকাল। তারপর দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে পুলিশ ইন্সপেক্টরকে বলল, 'চলুন।'

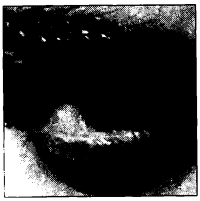

সারা রাত একদম ঘুমায়নি ওরা। গতকাল সন্ধ্যার পরপরই খবরটা প্রথম পেয়ে যায় ত্রিদিব। তারপর সেটা মিতু আর মিমিকে জানাতেই ওরা ছুটে এসেছে থানায়। তখন থেকেই বসে আছে ওরা এখানে। এরই মধ্যে যার যতটুকু সাধ্য ততটুকু চেষ্টা করেছে। কিন্তু কোনো কিছুই হয়নি। কেবল মিমির বাবা কোথায় যেন একটা ফোন করেছিলেন, তাতেই সবকিছু সমাধান হয়ে যায়। দুপুরের আগেই ছেড়ে দেওয়া হবে রাশীককে।

সকাল হচ্ছে। থানার সামনের আমগাছটাতে অনেকগুলো কাক ইচ্ছেমতো চেঁচাচ্ছে। সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে—এই সাতসকালে থানায় কয়েকটা লোক এসেছে কেস করতে। তাদেরই একজন একটু পরপরই চিৎকার করে উঠছে আর বলছে, 'মরে গেলাম আমি।' লোকটা হাতচাপা দিয়ে রেখেছে মাথায়, কিন্তু তার হাতের নিচ দিয়ে রক্ত ঝরছে অল্প অল্প। সে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে দায়িত্বপ্রাপ্ত এক পুলিশ অফিসারের সামনে। কিন্তু পুলিশ অফিসার এক মুহূর্তের জন্য তাকাচ্ছেন না তার দিকে। যেন মাথা থেকে এ রকম রক্ত ঝরা খুবই সাধারণ একটা ব্যাপার। কিছুক্ষণ পর তিনি ঘুমজড়িত কণ্ঠে বললেন, 'ঘটনা কী?'

লোকগুলোর একজন একটু নড়েচড়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'মাথায় লাঠি দিয়ে বাড়ি দিছে স্যার।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি, আসল ঘটনা বলেন।'

'আসল ঘটনা হলো—।' লোকটা আবার একটু নড়েচড়ে বিশাল একটা বক্তৃতা দেওয়ার ভঙ্গিতে দাঁড়াতেই পুলিশ অফিসার বললেন, 'কথা সংক্ষেপ।'

'স্যার, ওর জমি দখল করতে এসেছিল পাশের এলাকার ময়েজ।'

'তারপর মারামারি বেধে যায়, এই তো?'

'জি স্যার।'

'যান, সবাই এখন বাইরে গিয়ে দাঁড়ান, সময় হলে ডাকব।'

লোকগুলো বের হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিমি ফিসফিস করে বলল, 'একটা ব্যাপার খেয়াল করেছিস?'

ত্রিদিব হাঁ করে নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'কি?'

'দেশে তো মনে হয় দু-তিনটা ঘটনা ছাড়া আর কোনো ঘটনাই ঘটে না।'

'যেমন?' রাশীক মিমির দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকায়।

'থানায় এসে কোনো কিছু খেয়াল করিসনি?'

'কী?'

'আমরা আসার পর প্রায় বারো-তেরো ধরনের লোক এসেছে থানায়। এর মধ্যে চারটা হচ্ছে—একজনের বউ অন্যজনের সঙ্গে চলে যাওয়া, পাঁচটা এসেছে কাজের মেয়ে সংক্রান্ত, বাকিগুলো এসেছে মারামারির ঘটনা নিয়ে।'

'তুই এটা খেয়াল করেছিস, আর আমি খেয়াল করলাম অন্য একটা জিনিস।' দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে মিতু থানার জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকায়।

মিমি মিতুর হাতের ওপর একটা হাত রেখে বলল, 'কী?'

'সারা রাত কেটে গেল, অথচ দেখ, রাশীকের বাবা-মা একবারের জন্য এলেন না।' খুব দুঃখী দুঃখী গলায় বলল মিতু।

'তারা কেন এলেন না, সম্ভবত ব্যাপারটা আমি জানি।' ত্রিদিব মিতুর দিকে তাকাল।

'কেন?' মিতু জিজ্ঞাসা করল।

'সেটা পরে বলি। তবে রাশীককে আজ এখান থেকে যেতে হলে ওর বাবাকে লাগবে।'

'ওর বাবাকে লাগবে কেন?' মিমি কিছুটা উত্তেজিত হয়ে বলল।

'রাশীকের অভিভাবক হিসেবে একটা কাগজে সই করতে হবে তাকে।'

'রাশীক কি তাকে অভিভাবক মানে?'

'তা না মানুক, তবু তো তিনি রাশীকের বাবা।'

বাথরুম থেকে হাতমুখ ধুয়ে এসে পুলিশ অফিসার বললেন, 'আপনারা কি চা খাবেন?'

'না থ্যাঙ্কস। আমরা সামনের হোটেল থেকে খেয়ে নেব।' রাশীক বলল।

'আপনারা কি এর আগে কখনো থানায় এসেছেন?'

'না।'

'এটা হচ্ছে একটা অদ্ভুত জায়গা। কাল রাতে আপনারা যখন এলেন, তখন একটা ছিনতাইকারীকে পেটাচ্ছিলাম আমি। ওই ম্যাডাম—।' মিতুর দিকে

তাকিয়ে পুলিশ অফিসারটি বললেন, 'তা দেখে প্রায় কেঁদে ফেলেছিলেন। অথচ জানেন, আমাদের একটুও কান্না আসে না। প্রতিদিন আমরা যতগুলো বদমাশকে পেটাই, তাতে যদি আমরা কাঁদতাম, তাহলে প্রতিদিন আমাদের চোখের জলে দেশটা ডুবে যেত।'

'আপনাদের কখনোই কান্না আসে না?' মিতু ছলছল চোখে বলল।

'না। তবে একবার আমি কেঁদেছিলাম।' পুলিশ অফিসারটি চেয়ারের সঙ্গে হেলান দিয়ে আয়েশ করে বসে বললেন, 'এক হারামজাদা তার এক দিন বয়সী মেয়েকে গলা টিপে মেরেছিল। '

'কেন?' মিমি একটু ঝুঁকে বসে বলল।

'ওর এর আগের তিনটা মেয়ে হয়েছে, এবার ভেবেছিল ছেলে হবে। কিন্তু—।' পুলিশ অফিসারটি একটু থেমে বলেন, 'হারামজাদা ওই মাসুম বাচ্চাটাকে গলা টিপে ধরে, সঙ্গে সঙ্গে মারা যায় মেয়েটা। থানায় ধরে আনার পর এমন মার দিয়েছিলাম! তারপর অনেকক্ষণ কেঁদেছি। খুব মায়া লেগেছিল মেয়েটার জন্য।'

খট খট শব্দ করে একটা মেয়ে ঢোকে রুমে। তারপর পুলিশ অফিসারটির সামনে গিয়ে বলে, 'এক্সকিউজ মি, আপনারা রাশীক নামে একজনকে ধরে এনেছেন। আমি কি জানতে পারি, কেন আপনারা ওকে ধরে এনেছেন?'

'অবশ্যই।' পুলিশ অফিসারটি একটু সোজা হয়ে বসলেন। তারপর বললেন, 'বসুন।' মেয়েটা চেয়ারে বসতেই তিনি বললেন, 'তার আগে বলুন, আপনি কোথা থেকে এসেছেন?'

'আমি রাশীকের বন্ধু।'

মিমি, ত্রিদিব, মিতু ঝট করে ঘুরে তাকাল মেয়েটির দিকে। খুব আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে বসে আছে মেয়েটি। খুব অভিজাত একটা ড্রেস পরেছে সে, অল্প একটু সেজেছেও, কিন্তু কোনো অর্নামেন্টস নেই তার শরীরে—গলায় মালা নেই, কানে দুল নেই, হাতে চুড়ি নেই, কোনো কিছুই নেই।

'ওনারাও রাশীক সাহেবের বন্ধু।' পুলিশ অফিসারটি ত্রিদিবদের দেখিয়ে বললেন।

মেয়েটি ঘুরে ত্রিদিবদের দিকে তাকাল। তারপর চেয়ার থেকে উঠে ওদের দিকে এগিয়ে এসে বলল, 'যদি আমার ভুল না হয়, তাহলে আপনাদের মধ্যে কেউ একজন মিতু, কেউ একজন মিমি।' মেয়েটি ত্রিদিবের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আর আপনি হচ্ছেন ত্রিদিব।'

'আপনি?' ত্রিদিব কিছুটা অবাক হয়ে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করল।

'আমি রাশীকের বন্ধু, বলতে পারেন ছিলাম। এখনো আছি কি না—সেটা বলতে পারব না। আচ্ছা, রাশীকের এ অবস্থা কেন?'

'তেমন কিছু না, ছোট্ট একটা কারণ ছিল।'

'ছোট্ট একটা কারণে ওকে ধরে নিয়ে এসেছে!' মেয়েটি খুব অবাক হয়ে বলল, 'শুনেছি, অনেক বড় কিছু করেও এ দেশের অনেক মানুষ শাস্তি পায় না, খুনিরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ায়, রাস্তার মোড়ে মোড়ে ছিনতাইকারী, অনেকে সরকারি জমি দখল করছে। আপনাদের রাষ্ট্রপতিও নাকি কোনো এক মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামির সাজা মওকুফ করে দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনাদের খারাপ লাগেনি?'

'আমাদের খারাপ লাগা নিয়ে ক্ষমতাবানদের কারো কিছু আসে-যায় না।' ত্রিদিব একটু শব্দ করে বলল, 'আমরাও সবাই প্লাস্টিক মেরুদণ্ডের মানুষ হয়ে গেছি।'

'এভাবে কত দিন চলবে?'

'জানি না, জানি না।' মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ত্রিদিব বলল।

মেয়েটি চলে যাচ্ছে। ত্রিদিব পেছন থেকে ডেকে বলল, 'আপনার নামটা...?'

ম্লান হেসে মেয়েটি বলল, 'মানুষ কখনো কখনো তার নিজের পরিচয় ভুলে যায়, আমিও ভুলে গেছি।'

থানার সামনে হঠাৎ একটা গাড়ি এসে থামে। ত্রিদিব তাকিয়ে দেখে, রাশীকের বাবা আর মা গাড়ি থেকে নামছেন। যতটা ঘুম হলে মানুষের চোখে-মুখে শান্তির ভাব আসে, তাদের দুজনকে দেখে তা-ই মনে হচ্ছে—ত্রিদিবের, মিমির, মিতুরও।

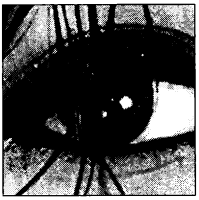

মুগ্ধ চোখে রাশীক ঋতুর দিকে তাকাল। মিটিমিটি হাসছে ও। মুখের সঙ্গে ওর বাঁকানো ভ্রূ দুটোও হাসছে, তার চেয়ে বেশি হাসছে ওর চোখ দুটো। মাথার চুলগুলোর নিচের অংশটা একটু কোঁকড়ানো, বড়ও না ছোটও না, পিঠের ঠিক মাঝখানে এসে থেমে গেছে সেগুলো। ঋতুর সবকিছুই বদলে গেছে। অথচ ও একেবারে অন্য রকম ছিল।

'আমাদের প্রথম পরিচয়ের কথাটা তোমার মনে আছে তো?' ঋতু হাসতে হাসতে বলল।

'তুমি কি মনে করো আমি ভুলে গেছি?' রাশীকের মুখটাও হাসি হাসি, কিন্তু গম্ভীর গলায় বলে ও।

'তোমাকে দেখে এখন আমার তা-ই মনে আছে।'

'তাই?'

'হ্যাঁ।'

'একটা মানুষ রক্তের জন্য মারা যাচ্ছে, পড়ে আছে রাস্তায়, সে মানুষটাকে তুমি একটা হাসপাতালে নিয়ে গেলে, আর সেখানেই তোমার সঙ্গে দেখা। ঠিক?' রাশীক হাসি হাসি মুখে ঋতুর দিকে তাকায়।

'ঠিক।' ঋতুও হাসতে থাকে।

'অথচ সে মানুষটা তোমার কোনো আত্মীয় ছিল না। একটা অজানা-অচেনা মানুষের জন্য তোমার দায়িত্ববোধ মুগ্ধ করেছিল আমাকে।'

'আমিও তখন অচেনা ছিলাম। তুমিও তখন এ অচেনা মানুষটাকে সাহায্য করেছিলে, মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম আমিও। মানুষের বন্ধুত্বটা মনে হয় এভাবেই হয়।'

'আমার সব মনে আছে ঋতু।'

'সব মনে আছে?' ঋতু গভীর চোখে রাশীকের দিকে তাকায়, 'তোমার মনে আছে—পরিত্যক্ত একটা ট্রেনের কামরায় তিনটা ছেলে আমাকে রেপ করেছিল।

তারপর প্রতিবেশীদের গুঞ্জন সহ্য করতে না পেরে তোমাদের এই শহরে পালিয়ে এলাম।'

'তুমি আর কখনো এ প্রসঙ্গটা আনবে না।'

'কেন?'

'আমার ভালো লাগে না।'

'ভালো কি আমারও লাগে! এই যে চারটা বছর দেশের বাইরে ছিলাম, এক মুহূর্তের জন্যও ভুলিনি—আমি একজন ধর্ষিতা।'

'এ কথাটা ভুলে যাওয়া যায় না?'

'এটা কি ভোলা যায় রাশীক? একটা মেয়ের সমস্ত অস্তিত্ব বদলে গেল একদিন, সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে গেল এক মুহূর্তে, সমস্ত জীবন বদলে গেল নিমিষে। সে কী করে ভোলে, সে কী করে ভোলে তার সেই সর্বনাশের কথা!'

'তবুও।'

'তবুও আমি চেষ্টা করছি রাশীক।' দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে ঋতু বলল, 'একবার ভেবেছিলাম, কখনো আর দেশে ফিরে আসব না।'

'কেন সেটা ভেবেছিলে?'

'দেশে আর আমার কে আছে? আর— ।'

'আর?'

'কথাটা তোমাকে আগেও বলেছিলাম—ফেরার ব্যাপারটা অনেকাংশেই কারো অপেক্ষার ওপর নির্ভর করে রাশীক।'

'বাদ দাও ওসব। যে এনজিওর থ্রোতে বিদেশে গিয়েছিলে, সেটার খবর কী এখন?'

'সেটার একটা বড় কাজ নিয়েই দেশে এসেছি আবার।'

'কাজটা কী—বলা যাবে?'

'আমাদের দেশের ধর্ষিত মেয়েদের নিয়ে আমরা একটা কাজ করব। খুব হাসির একটা ব্যাপার, না?' ঋতু হাসতে হাসতে রাশীকের দিকে তাকায়।

'হাসির ব্যাপার কেন?'

'একজন ধর্ষিতা কাজ করবে অন্য ধর্ষিতাদের নিয়ে, হা-হা-হা।'

ঋতুর দিকে তাকিয়ে রাশীক চমকে ওঠে, ঋতু কাঁদছে।

দরজায় শব্দ হতেই রাশীক তাকিয়ে দেখে ত্রিদিব, মিমি আর মিতু ঢুকছে ঘরে। রাশীক উঠে দাঁড়িয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে বলে, 'ও হচ্ছে ঋতু।'

'সকালে আমাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, কিন্তু নাম বলেননি।' মিমি এগিয়ে গেল ঋতুর দিকে।

'ও, সকালে তাহলে তুমি গিয়েছিলে থানায়?' রাশীক একটু থেমে বলে, 'আর কাল রাতে তুমিই ফোন করেছিলে?'

'হ্যাঁ, ভেবেছিলাম তুমি আমার গলা শুনে চিনতে পারবে, কিন্তু...। যদিও দু বছর ধরে তোমার সঙ্গে আমার কথা হয় না। দু বছর আগে যখন কথা হতো, তখন তুমি প্রায়ই কথা প্রসঙ্গে ত্রিদিব, মিমি, মিতুর কথা বলতে।'

'ঋতু—।' রাশীক আগের জায়গায় বসতে বসতে বলে, 'আমরা একটা পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। বলতে পার ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা।'

রাশীকের কথাটা শেষ হওয়ার আগেই ঋতু বলল, 'তোমরা আমাকে সে পরিকল্পনায় রাখবে তো?'

'তুমি থাকবে?'

'যদি রাখো।'

'সে পরিকল্পনাটা বাস্তবায়নের আগে কয়েকটা মানুষ খুঁজেছি আমরা, সাহসী মানুষ।'

'পেয়েছ?'

'সম্ভবত দু-একজনকে পেয়েছি।'

'হবে এতে?'

'হয়ে যাবে।'

খুক্ করে একটু কেশে ঘরের সামনে এসে দাঁড়ান গ্রাম থেকে আসা সেই দাদা। হাসি হাসি মুখ করে তিনি রাশীকের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'আমি কি তোমাদের সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে পারি?'

রাশীক উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'দাদা আসুন, বসুন।'

দাদা রাশীকের জায়গাটাতে বসতে বসতে বললেন, 'তোমরা মানুষ খুঁজছ, তোমরা কি এর সঙ্গে আরো কিছু মানুষ খুঁজবে?'

'কী ধরনের মানুষ দাদা?' রাশীক সমস্ত মনোযোগ দিয়ে দাদার দিকে তাকিয়ে বলে।

'দেশের জন্য প্রাণ দিতে গিয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধা গৌরাঙ্গ বিশ্বাস, কিন্তু দেশ তাকে কিছুই দেয়নি। বান্দরবানের কালাঘাটায় এক পাহাড়ে থাকতেন তিনি অনেক দিন ধরে। কিন্তু সে জায়গাটি কখনো তাকে বন্দোবস্ত দেয়নি প্রশাসন। কয়েক দিন আগে এক প্রভাবশালী ব্যক্তি সে জায়গা থেকে তাকে উচ্ছেদের হুমকি দেয়। তারপর প্রচণ্ড অভাব-অনটন আর হতাশা নিয়ে কয়েক দিন পর মারা যান মুক্তিযোদ্ধা গৌরাঙ্গ।

লক্ষ্মীপুর জেলার দত্তপাড়া ইউনিয়নের নিহত মুক্তিযোদ্ধা নূর নবীর পরিবার

সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে তিন বছর আগে বাড়ি ছেড়েছে। সন্ত্রাসীদের ভয়ে এখনো তারা বাড়ি ফিরতে পারেনি।' দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে দাদা বলেন, 'আমি সেসব মুক্তিযোদ্ধাকে খুঁজে বের করতে বলছি না। আমি তাদের মায়েদের খুঁজে বের করার কথা বলছি। রত্নগর্ভা সেসব মায়ের অনেকেই এখনো বেঁচে আছেন এবং তারা অবহেলিত, অপাঙ্‌ক্তেয়, মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন। তারা এক বেলা খেতে পান তো অন্য বেলা পান না। অথচ তাদের পেটের সন্তানরা একদিন এ দেশকে স্বাধীন করার জন্য জীবন দিয়েছিলেন।'

দাদুর চোখ ভিজে উঠেছে। তিনি টলটল চোখ নিয়েই বললেন, 'পৃথিবীর আর কোনো দেশের মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযোদ্ধার মায়েরা এত মানবেতর জীবন কাটান কি না, আমার জানা নেই। তোমরা পারবে না সেসব মাকে খুঁজে বের করতে? তোমাদের এ প্রজন্ম যদি এ কাজটা না করে, তাহলে আর কোনো দিনই এ কাজটা করা হবে না। মানুষ একদিন ভুলে যাবে এ দেশে একদিন মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল, এ দেশে একদিন মুক্তিযোদ্ধা ছিল এবং তাদের মায়েরাও ছিল।'

দূরে এক মসজিদ থেকে আজান ভেসে আসছে। দাদা উঠে দাঁড়িয়েছেন। রাশীকের সঙ্গে সঙ্গে ওরাও উঠে দাঁড়ায়। কেমন যেন কাঁপছে ওরা। কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে থাকার পর ওরা প্রায় একসঙ্গে বলে ওঠে, 'পারব, অবশ্যই পারব। পারতে আমাদের হবেই।'

বাবার ঘরের দরজায় টোকা দেওয়ার আগেই খুলে গেল দরজাটা। কিছুটা অবাক হয়ে বাবা বললেন, 'তুমি?'

'তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।' বাবার চোখের দিকে সরাসরি তাকাল রাশীক।

ঘড়ির দিকে তাকালেন বাবা, 'এখন তো রাত প্রায় দেড়টা। কথাটা তুমি এখনই বলবে, না কাল সকালে বলবে?'

'এখনই বলতে চাচ্ছি।'

'তোমার মা তো এখনো বাসায় ফেরেনি।'

'কথাটা আমি তোমাকে বলতে এসেছি।'

ঘর থেকে আর বের হলেন না বাবা। কিছুটা অনিচ্ছায় তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন ঘরের ভেতর। দুই পা এগিয়েই বললেন, 'এসো।'

নিজেকে ইদানীং কখনো অসহায় মনে হয় না রাশীকের। কিন্তু এ মুহূর্তে কেমন যেন একটু অসহায় লাগছে। সে টের পেল—তার শরীরটা একটু কাঁপছে। কিছুক্ষণ, কিছুক্ষণ এভাবে থাকার পর কিছুটা স্থির হলো রাশীক। তারপর সামনের দিকে তাকিয়ে দেখল অপলক চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে বাবা। চোখ দুটো সঙ্গে সঙ্গে নিচু করে ফেলল রাশীক। পরক্ষণেই মাথাটা উঁচু করে বলল, 'পারলে তুমি কাজটা করতে?'

বাবা বোধ হয় ধ্যান করছিলেন। কিছুটা চমকে উঠে তিনি সোজা হয়ে বসলেন, 'কোন কাজটা?'

পূর্ণ চোখে রাশীক বাবার দিকে তাকাল, 'তুমি জানো না কোন কাজটা?'

'তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না।।'

'না, বোঝার তো কিছু নেই বাবা। আজ সকালে তুমি আমাকে যেখানে থেকে নিয়ে এলে, অথচ কী আশ্চর্য! সেখানে তুমিই আমাকে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলে!'

'কে বলেছে তোমাকে এসব কথা?' বাবা ধমকে ওঠেন।

'ক্ষমতা বড় অদ্ভুত জিনিস বাবা। সেই ক্ষমতা পাওয়ার জন্য মানুষ কত কী করে, কত কী করেছে— ইতিহাস সাক্ষী। আর তুমি তো মাত্র নিজের ছেলেকে জেলে পাঠাতে চেয়েছিলে। যদিও আমি তোমার— ।' কথাটা শেষ না করেই রাশীক বলল, ' আচ্ছা, তোমার নমিনেশন কনফার্ম তো?'

'কিসের নমিনেশন?'

'আগামীতে সংসদ সদস্য হওয়ার।'

'আবোল-তাবোল এসব কী বলছ তুমি!'

'আবোল-তাবোল বলছি।' রাশীক একটু হাসার চেষ্টা করে, 'তোমাদের প্রধানমন্ত্রীর জন্য ক্লিয়ার করা রাস্তায় একটু দাঁড়িয়ে ছিলাম আমরা, সেটা অনেকেই জেনেছে, তুমিও জেনেছ। নিজেকে আত্মনিবেদিত, আপসহীন প্রমাণ করতে তাই নিজের ছেলেকে এবার ব্যবহার করলে। আচ্ছা, তোমাদের প্রধানমন্ত্রী কি জানেন এ ব্যাপারটা? আমার মনে হয় তিনি এ ক্ষুদ্র ব্যাপারটা জানেন না।' রাশীক একটু থেমে বলে, 'এত ক্ষুদ্র কেন, প্রধানমন্ত্রীরা অনেক বড় বড় ব্যাপারই জানেন না। জানলে রাতে এত ভালো ঘুম হতো না তাদের!

আচ্ছা বাবা, সংসদ সদস্য হলে কি তোমার সম্পদের হিসাব দেবে তুমি? হিসাব মেলাতে পারবে তো? আমার মনে হয় তুমি পারবে না, যেমন ক্ষমতাসীন নেতা কিংবা ক্ষমতাহীন নেতা—কেউই কোনো দিন হিসাব মেলাতে পারেন না। যদিও কখনো কোনো দিনই তাদের নিজ সম্পদের হিসাব দিতে হবে না, তারা দেবেনও না। 'আচ্ছা, ক্ষমতা পাওয়ার পর একেকজন মানুষ এত টাকার মালিক হয় কীভাবে? কী করেন তারা?'

'এসব কেন বলছ তুমি?'

'আমরা একটা পরিকল্পনা নিয়েছি, বলতে পারো ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা। তার আগে কিছু মানুষ খুঁজছি আমরা।'

'কিসের মানুষ?'

'এ প্রশ্নটা তুমি আগেও করেছ। আমরা কিছু সাহসী মানুষ খুঁজছি।'

'কেন?'

'কেন?' রাশীক নিচের ঠোঁটটা একটু কামড়ে বলে, 'এতগুলো বছর কেটে গেল, অথচ আলো হাতে একজন মানুষকেও এসে বলতে দেখলাম না—আমি আপনাদের বন্ধু, এ দেশ আমার বন্ধু। আসুন, আমরা সবাই মিলে ক্রমান্বয়ে অন্ধকারে পরিণত এ দেশকে আলোকিত করি। আচ্ছা বাবা তুমি বলতে পারবে, কতটা অসৎ হলে মানুষ রাজনীতি করে? কয়জন সৎ রাজনীতিবিদ আছেন

আমাদের?' দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাশীক, 'আমরা স্বপ্ন দেখতে ভুলে গেছি বাবা। আমরা ফুলের গন্ধ নিতে ভুলে গেছি, আমরা নদীর মৃদু মৃদু ঢেউ দেখতে ভুলে গেছি, আমরা সবুজ গাছ দেখতে ভুলে গেছি। সব কিছু বিবর্ণ আজ—কোথাও কোনো রঙ নেই, আনন্দও নেই!'

'তোমাকে এসব কথা কে শিখিয়েছে?'

'কেউ না বাবা। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে যেমন দুর্বলতরও কেউ ঘুরে দাঁড়ায়, আমারে সে রকম ঘুরে দাঁড়ানোর সময় এসেছে বাবা—এখন, এখনই।'

'কী করবে তোমরা?'

রাশীক অপূর্বভাবে হেসে ওঠে, 'অনেক চিন্তা করে আমরা সে পরিকল্পনাটা করেছি। আগাছাকে যেমন সমূলে উপড়ে ফেলতে হয়, তেমনি এ দেশ থেকে কমপক্ষে কয়েক হাজার আগাছাকে উপড়ে ফেলতে হবে। নির্দ্বিধায় তাদের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে—যারা এ দেশের জন্য অকল্যাণকর, অমঙ্গলকর।'

'পারবে?'

সমস্ত শরীরে অমোঘ শক্তি নিয়ে এই প্রথম একটু শব্দ করে রাশীক বলল, 'পারতে আমাদের হবেই।' রাশীক একটু থামে, তারপর আবার বলে, 'এবং সে কাজটা প্রথমে তোমাকে দিয়েই শুরু করতে চাচ্ছি, এখনই।'

খুব ধীরে ধীরে পকেটে হাত ঢুকাল রাশীক। মাথাটা নিচু করে কী যেন ভাবল সে। কীছুক্ষণ পর মাথাটা উঁচু করে সামনের দিকে তাকাল আবার। আশ্চর্য! সামনে কোনো মানুষ দেখছে না সে। সে স্পষ্টভাবে দেখল, শত শত দানব পড়ে আছে সামনে। তারা মাটিতে পড়ে আছে, তারা মাটিতে মিশে যাচ্ছে, সে মাটিতে ঘাস জন্মাচ্ছে, সে ঘাস একটু একটু করে বড় হচ্ছে—কেবল ছোট্ট একটা ফুল ফোটাবে বলে, শান্ত নীল একটা ফুল ফুটবে বলে!